• অন্ধকারের অতিথি •

রাত খুব বেশি হয় নি, কিন্তু লোডশেডিং এর কল্যাণে গলিটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যেই অস্পষ্টভাবে দেখা যায় একটি খালি রিকশার সামনে একটি তরুণীকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে তিনটি মানুষ—চাপা গলায় বাদানুবাদ, নারীকণ্ঠের করুণ মিনতি আর পুরুষের কর্কশ কণ্ঠ ভেসে আসে পথ-চলতি পথিকের কানে।

কলকাতা শহরের বুদ্ধিমান মানুষ এইরকম দৃশ্য দেখলে দেখেও-না-দেখার ভাণ করে সরে পড়ে; কিন্তু যে-যুবকটি গলিপথে হেঁটে আসছিল, সে হয় নিতান্ত নির্বোধ আর নয়তো এই শহরে সে নবাগত—বর্তমান কলকাতার পরিস্থিতি সম্পর্কে সে আদৌ অবহিত নয়।

অতএব একটি লোক যখন তরুণীর হাত থেকে ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়েছে এবং তার পাশের লোকটি মেয়েটির করুণ প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে হাতঘড়িটা নেওয়ার উদ্দেশ্যে তার হাত চেপে ধরেছে, ঠিক সেই সময়ে পথিকটি পাশ কাটিয়ে বুদ্ধিমানের মতো সরে না গিয়ে এগিয়ে এসে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে অনুরোধ করল "আপনার ঘড়ির দরকার থাকলে কিনে নেবেন, দোকানে অনেক ঘড়ি পাওয়া যায়। দয়া করে ওঁর হাতটা ছেড়ে দিন।"

গুণ্ডাটা চমকে উঠল, কিন্তু অনুরোধ রাখল—মেয়েটির হাত ছেড়ে সে পিছিয়ে এল, সঙ্গে সঙ্গে তার ডানহাতে একটা ধারাল ছোরা অন্ধকারেও চক চক করে উঠল।

ছোরাটা উঁচিয়ে ধরে সে কর্কশ স্বরে বলল, "তোমাকে দালালি করতে কে ডেকেছে? সোজা চলে যাও এখান থেকে।"

পাশে দাঁড়ান দুই স্যাঙাত জামার নিচে হাত দিল বোধহয় লুকানো অস্ত্র বা'র করার জন্য; কিন্তু তারা অস্ত্র বা'র করার আগেই ঘটল এক অভাবিত কাণ্ড—

পথিকের ডান হাত বিদ্যুদ্বেগে ছুরিকাধারীর মুখের উপর ছোবল মারল, সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ করে লোকটা ছিটকে পড়ল রাস্তার উপর! তার দুই সঙ্গী সবিস্ময়ে দেখল তাদের দোস্ত দুই হাতে মুখ চেপেধরে ছটফট করছে! বলাই বাহুল্য, হাতের ছুরিটা আগেই হস্তচ্যুত হয়ে পড়ে গিয়েছিল মাটির উপর!

বিস্ময়ের চমক কাটার আগেই পথিক আবার আক্রমণ করল। যে-গুণ্ডাটা মেয়েটির ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়েছিল, এবারের শিকার হল সে। দু'জনের মাঝখানে প্রায় পাচ ছয় হাত রাস্তা পথিক পেরিয়ে গেল চোখের নিমিষে, পরক্ষণেই কি ঘটল ঠিক বোঝা গেল না—শুধু দেখা গেল, ব্যাগ হাতে গুণ্ডাটা তিন-চার হাত দূরে ছিটকে পড়ে একেবারে স্থির হয়ে গেল! লোকটা আর্তনাদ করারও সময় পায় নি!

পাথক এইবার ঘুরে দাঁড়াল তৃতীয় ব্যক্তির দিকে, "ছুরি-ছোরা দেখলে আমার মাথা গরম হয়ে যায়, বুঝেছ ? এবার সোজা কেটে পড় এখান থেকে, নাহলে তোমার অবস্থাও হবে তোমার বন্ধুদের মতো।"

লোকটা ইতস্ততঃ করছিল, কিন্তু পথিক তার দিকে এগিয়ে আসার উপক্রম করতেই সে তৎক্ষণাৎ 'দুর্জনের' সান্নিধ্য ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল—

চোখের পলকে পিছন ফিরে এক দৌড়ে সে অদৃশ্য হয়ে গেল অকুস্থল থেকে ! ধরাশায়ী দুই বন্ধুর দিকে একবারও দৃষ্টিপাত করল না !

মাটিতে পড়ে-থাকা ব্যাগটা কুড়িয়ে নিয়ে পথিক মেয়েটির হাতে দিল, "এবার চলুন, এখান থেকে সরে পড়া যাক।"

মেয়েটি এদিক-ওদিক দৃষ্টিনিক্ষেপ করল রিকশাওয়ালার উদ্দেশ্যে। কিন্তু তার দেখা পাওয়া গেল না। লোকটা গোলমালের সূত্রপাত দেখে আগেই সরে পড়েছে নিঃশব্দে।

মেয়েটির মনের ভাব বুঝে পথিক বলল, "রিকশার আশা করে লাভ নেই। আপনি কোথায় যাবেন ?"

কম্পিত স্বরে উত্তর এল, "দেবেন্দ্র মল্লিক রোড।"

—"ওঃ ! তাহলে তো কাছেই। চলুন, আমিও ঐদিকেই যাব।"

সামনের সাদা একতলা বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে তরুণী বলল, "এটাই আমার বাড়ি।"

—"এই বাড়ি ?"

পথিকের কণ্ঠস্বরে বিস্ময়ের আভাস পেয়ে তরুণী ফিরে তাকাল, "হ্যাঁ, এই বাড়ি। কিন্তু আপনি যেন চমকে গেলেন মনে হচ্ছে ?"

"না চমকাই নি তো", "পথিক এবার সহজ ভাবেই বলল, "চমকানোর কি আছে ?"

তরুণীর মনে হল তার সঙ্গী যেন কিছু গোপন করতে চাইছে, কিন্তু এই বাড়িটাই তার বাসস্থান জেনে বিস্মিত হওয়ার কি আছে তা ভেবে পেল না। সে আর কোন কথা না বলে দরজার কড়া নাড়ল।

পথিক বলল, "এবার তো আপনি নিরাপদ। আমি এখন যেতে পারি ?"

"সেকি !" তরুণী মৃদু হাসল, "মায়ের সঙ্গে দেখা করবেন না ?"

পথে আসতে আসতেই মেয়েটি তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছে—বাবার মৃত্যুর পর সে মায়ের সঙ্গে রয়েছে ; বি· এ· পাশ করে ভাগ্যক্রমে একটি বিদ্যালয়ে সে শিক্ষিকার কাজ পেয়ে যায়। অবসর সময়ে কয়েকটি ছাত্রীকে পড়ায়। তার উপার্জিত অর্থেই মা আর মেয়ের অন্নবস্ত্রের সংস্থান হয়। বাবা ঐ বাড়িটি ছাড়া কিছু রেখে যেতে পারেন নি। সাধারণতঃ রাত আটটার মধ্যেই সে বাড়িতে এসে পড়ে, কিন্তু আজ এক ছাত্রীর বাড়িতে দেরি হয়ে গেছে—পথে এই বিপত্তি।

অবশ্যই নিজের থেকে এত কথা বলতে চায় নি মেয়েটি, কিন্তু পথিক যখন রাতবিরেতে একা ঘুরে বেড়ানোর জন্য তাকে মৃদু তিরস্কার করল এবং নারী স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ পরিণাম দেখিয়ে আধুনিকাদের কটাক্ষ করে মন্তব্য প্রকাশ করল, তখন আর চুপ করে থাকা সম্ভব হল না...

মেয়েটি তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেও পথিক নিজের সম্পর্কে বিশেষ কিছুই বলে নি। এদিকে সে কোথায় এসেছে জানতে চাওয়ায় পথিক যেন বিব্রত বোধ করেছে, তারপর বলেছে তার বন্ধুর এক পরিচিত ব্যক্তির সন্ধানেই সে এদিকে এসেছিল—রাস্তার নাম তার মনে আছে, কিন্তু যে-কাগজে উক্ত ভদ্রলোকের নাম-ঠিকানা লেখা ছিল, সেটা সে হারিয়ে ফেলেছে। শুধু রাস্তার নাম দেখে কলকাতা শহরে কোন ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া যে অতিশয় দুরূহ, মেয়েটির এই মন্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হয়ে সে বলেছে, পথে বেরুনোর সময়ও কাগজটা তার সঙ্গে ছিল, কিন্তু এখন সে কাগজটা পাচ্ছে না—হয়তো মারামারির সময়ে কাগজটা রাস্তায় পড়ে গেছে। ব্যাপারটা একেবারে অসম্ভব নয়, কিন্তু মনে হল পথিক সত্যি কথা বলছে না—তবু যে-লোক তার অর্থ ও সম্মান বাঁচিয়েছে তাকে আর জেরা করে নি সীমা।

সীমা ;—সীমা চৌধুরি। পথে আসতে আসতে তার নাম জানিয়েছে সীমা পথিক বন্ধুকে। পথিকের নামটাও সে জেনেছে এর মধ্যে। নিতান্ত সৌজন্যের খাতিরেই অঞ্জন ঘোষ তার নাম জানিয়েছে সঙ্গিনীকে ; কিন্তু তার বাসস্থান সম্পর্কে প্রশ্ন করতেই বিব্রত বোধ করেছে। আমতা-আমতা করে অঞ্জন জানিয়েছে কর্মস্থল দিল্লি থেকে পার্ক সার্কাসে এক বন্ধুর বাড়িতে সে দু'দিন হল এসেছে, তবে ঠিকানাটা তার মনে নেই। তার গন্তব্যস্থল এবং বর্তমান বাসস্থান সম্পর্কে স্মরণশক্তির নিদারুণ দুর্বলতা খুব স্বাভাবিক মনে হয় নি সীমার কাছে। শোনা যায়, ভাবুক প্রকৃতির কবি কিংবা শিল্পীরা দারুণ আপন ভোলা হয়, কিন্তু অঞ্জন ঘোষ মানুষটাকে কবি বা শিল্পী বলে ভাবতেই পারে না সীমা। দিল্লিতে সে কি কাজ করে এই প্রশ্নটাও সীমার মনে এসেছিল, কিন্তু যে-লোক নিজের সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছুই বলতে চায় না, তাকে আর প্রশ্ন করার প্রবৃত্তি হয় নি সীমার।

কিন্তু নিজের সম্পর্কে কিছু বলতে যতই অনীহা থাক, সীমার সম্বন্ধে অঞ্জন ঘোষের আগ্রহের অভাব ছিল না। বিশেষ করে সীমার বাবা মহাদেব চৌধুরির নামটা শোনার পর থেকেই সীমার বিষয়ে তার কৌতূহল যেন হঠাৎ অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠেছে। সত্যি

কথা বলতে কি, সীমার পিতৃনাম শোনার আগে পর্যন্ত অঞ্জন ঘোষের আচরণে একটা নির্লিপ্ত সৌজন্যবোধ ছাড়া বিশেষ মনোযোগের আভাস দেখা যায় নি। কিন্তু 'মহাদেব চৌধুরি' নামটা শোনামাত্র তার চমকটা সীমার চোখে পড়েছে এবং তারপর থেকেই অঞ্জন ঘোষ যেন সীমার অস্তিত্ব সম্পর্কে বড় বেশি রকম সচেতন হয়ে উঠেছে।

অঞ্জন ঘোষ মানুষটাকে কেমন যেন গোলমেলে মনে হয়েছে সীমার, কিন্তু যে-মানুষটা তাকে এইমাত্র বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে, তাকে বাড়ির দরজা থেকে বিদায় দেওয়ার কথা ভাবাই যায় না—অতএব ভিতরে আমন্ত্রণ জানিয়েছে সীমা। শুধু কৃতজ্ঞতাবোধ নয়, মানুষটাকে এর মধ্যেই তার ভালো লেগে গেছে…

অঞ্জন ঘোষ খুব লম্বা চওড়া নয়, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে নিতান্তই সাধারণ। তার মতো একটি মানুষ কয়েক মুহূর্তের মধ্যে যেভাবে সশস্ত্র গুণ্ডাদের কাবু করল, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। তার বিস্ময়কর কীর্তি আর সংযত ভদ্র ব্যবহার সীমাকে আকৃষ্ট করেছিল, তার উপর কৃতজ্ঞতাবোধ তো ছিলই। অঞ্জন মুখে বিদায় চাইলেও এখনই বোধহয় সীমার সান্নিধ্য ত্যাগ করতে ইচ্ছুক ছিল না ; তাই সীমা যখন মায়ের সঙ্গে দেখা করে যেতে বলল, সে মৃদু হেসে চুপ করে রইল। মনে হয় এই ধরণের অনুরোধই আশা করেছিল সে।

দরজার কড়া ধরে আবার নাড়তে যাচ্ছিল সীমা, কিন্তু তার আগেই দরজা খুলে গেল। খোলা দরজার উপর এসে দাঁড়াল একটি নারীমূর্তি। অঞ্জন বুঝল, ইনিই সীমার মা। মহিলাটির হাতে বা গলায় অলঙ্কারের চিহ্নমাত্র ছিল না, কালো পাড়ের সাদা শাড়িটাও নিতান্তই সাধারণ—তবু অস্পষ্ট আলো-আঁধারির মধ্যেও তার মুখশ্রীতে আভিজাত্যের স্বাক্ষর দেখতে পেয়েছিল অঞ্জন।

হঠাৎ লোড-শেডিং এর অভিশাপ-মুক্ত হয়ে সারা এলাকাটা আলোয় আলোয় ঝলমল করে উঠল। মুক্তদ্বারপথে এক ঝলক আলো এসে পড়ল অঞ্জনের গায়ের উপর।

মাকে কিছু বলতে যাচ্ছিল সীমা, কিন্তু তার আগেই তিনি চিৎকার করে উঠলেন, "একী! এ কী ব্যাপার!"

মায়ের দৃষ্টি অনুসরণ করে সঙ্গীর দিকে দৃষ্টিপাত করেই চমকে উঠল সীমা "রক্ত! আপনার জামাটা যে রক্তে ভিজে গেছে!"

হ্যাঁ, অঞ্জনের হাল্কা-ধূসর সোয়েটারে বুকের কাছে লাল রক্তের ছাপ হঠাৎ-আলোর ঝলকানিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে! দ্রুত এগিয়ে এসে দরজার চৌকাঠে পা রেখে সে বলল, "চলুন, ভিতরে চলুন।"

মহিলা সামনে এসে তাদের একটা ঘরের মধ্যে নিয়ে এলেন। সোফার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সীমা বলল, "অঞ্জনবাবু, বসুন।"

তারপর মায়ের দিকে ফিরল, "মা, আমি পথে গুণ্ডার খপ্পরে পড়েছিলুম। ইনি আমায় উদ্ধার করেছেন। এঁর নাম অঞ্জন ঘোষ। আর অঞ্জনবাবু বুঝতেই পারছেন, ইনি আমার মা।"

অঞ্জনের দিকে অনুযোগপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সীমা বলল, "অন্ধকারে বুঝতে পারিনি, বুকে ছুরির খোঁচা লেগেছে। কথাটা একবার বলবেন তো? দরজা থেকেই তো বিদায় নিচ্ছিলেন। আমরা কি এতই অকৃতজ্ঞ আর স্বার্থপর যে, ওষুধ-বিষুধ না লাগিয়েই আপনাকে দরজা থেকে বিদায় করে দেব?"

কুণ্ঠিতভাবে হেসে অঞ্জন বলল, "না তা নয়। ছুরির খোঁচা লাগে নি। ওটা গুণ্ডাদের গায়ের রক্ত।"

"বাজে কথা," সীমা উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল, "অঞ্জনবাবু, লোকটাকে আপনি লোহার রড কিংবা ছুরি দিয়ে মারেন নি, হাতেই মেরেছেন। অতটা রক্ত ছিটকে আপনার গায়ে লেগেছে বলতে চান?—জামা খুলুন, আমি দেখব।"

"হ্যাঁ, জামাটা খুলে ফেল," সীমার মা বললেন, "আমিও একবার দেখতে চাই। বিপদের সময় সঙ্কোচ করতে নেই।"

আমতা-আমতা করে অঞ্জন বলল, "কিন্তু বিপদ তো হয় নি।"

"সেটা আমি বুঝব," সীমার মা এগিয়ে এসে তার কাঁধে হাত রাখলেন, "তুমি বললাম বলে কিছু মনে কোরো না বাবা, তুমি আমার ছেলের মতো।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়, তুমি বলবেন বই কি," দ্বিধাগ্রস্তভাবে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে অঞ্জন বলল, "কিন্তু জামাটা কি খুলতেই হবে?"

মৃদু হেসে মা বললেন, "হ্যাঁ।"

নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই সোয়েটার এবং শার্ট খুলে ফেলল অঞ্জন। তাতেও নিষ্কৃতি নেই, অতএব গেঞ্জিটাও খুলতে হল। না, কোথাও আঘাতের দাগ বা রক্ত দেখা যাচ্ছে না। সত্যি কথাই বলেছে অঞ্জন। কিন্তু অঞ্জনের নিরাবরণ ঊর্ধ্বাঙ্গের দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল সীমা—

দৃঢ় পেশীবদ্ধ দেহ ; বুকে পেটে, কাঁধে কোথাও মেদের অস্তিত্ব নেই, শুধু দেখা যায় ঢেউ-খেলানো মাংসপেশীর বিস্তার! একেই বোধহয় বলে 'বর্ণচোরা আম!' এতক্ষণে সীমা বুঝল, একটু আগে যে ভেলকিটা দেখিয়েছে অঞ্জন, তার উৎস কোথায়!

কিন্তু শুধু পেশীর সৌষ্ঠব নয়, আর একটি বস্তু সীমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল—বুকের নিচে পাঁজরের কাছে তিনটি সমান্তরাল দীর্ঘ ও গভীর ক্ষতচিহ্ন রয়েছে অঞ্জনের দেহে, মনে হয় ত্রিশূলের মতো কোনও ধারালো অস্ত্র দিয়ে কেউ পাঁজরের উপর ঐ ক্ষতচিহ্ন তিনটিকে এঁকে দিয়েছে!

সীমা বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, "কী ভীষণ ! এমনভাবে কেটে গিয়েছিল কি করে ?"

অত্যন্ত বিব্রত হয়ে অঞ্জন বলল, " ও কিছু নয় । অনেকদিন আগে একটা বনবেড়াল আঁচড়ে দিয়েছিল ।"

"বনবেড়াল ।" সীমার দুই চোখে বিশ্বাস ও অবিশ্বাস, "বনবেড়াল এমন সাংঘাতিক ভাবে আঁচড়ে দিল ? তা বনবেড়ালটার কবলে পড়লেন কি করে ? খুব বনে বনে ঘুরতেন বুঝি ?"

"ইয়ে, তা একসময় ঘুরেছি বই কি," অঞ্জনের মুখ কাঁচুমাচু ।

"কিন্তু বনবেড়াল কি হঠাৎ মানুষকে তেড়ে এসে আঁচড়ে দেয়," সীমার ভ্রুতে কুঞ্চনরেখা, "আর বনবেড়ালের নখে এমন সাংঘাতিক ক্ষত হয় ?"

"হয়, হয়, মস্ত বড় বনবেড়াল যে ।" তাড়াতাড়ি গেঞ্জিটা তুলে নেয় সে, কিন্তু গায়ে দেবার আগেই বাধা পড়ল ।

"তোমার বাঁ হাতের উপর এই লাল জড়ুলটা ভারি অদ্ভুত," সীমার মা এতক্ষণ কোন কথা বলেন নি, ক্ষতচিহ্নের পরিবর্তে অঞ্জনের বাহুর উপর লাল চিহ্নটাই যেন তাঁকে বেশি আকৃষ্ট করেছে, "এটা কি জন্ম থেকেই রয়েছে ?"

বলতে বলতেই বাহুর উপর জড়ুলচিহ্নটায় হাত রাখলেন তিনি ।

"তাই তো শুনেছি"—চটপট জামা পরে ফেলে অঞ্জন ।

"আমি একজনকে জানতাম," অঞ্জনের চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাইলেন সীমার মা, "তার বাঁ হাতের উপরদিকে ঠিক এই রকম অর্ধচন্দ্রের মতো লাল জড়ুল ছিল । ঠিক এই রকম ।"

"হতে পারে," অঞ্জন অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, "দুটো মানুষের মধ্যে সাদৃশ্য থাকা অসম্ভব নয় ।"

• রহস্যময়ী শ্রীময়ী •

'আপনি দয়া করে আমার সোয়েটারটা একটা কাগজে মুড়ে

দেবেন ?" অঞ্জন সীমাকে উদ্দেশ্য করে বলল, "বুঝতেই পারছেন রক্তমাখা সোয়েটার নিয়ে রাস্তায়"—

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন," "সোয়েটারটা নিয়ে পাশের ঘরের দিকে পা বাড়াল সীমা, "আর একটু চা খেয়েও যাবেন।"

অঞ্জন উত্তর দিল না। তার স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে দেয়ালের উপর একটি বাঁধানো ফটোগ্রাফের দিকে। সে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল, খুব কাছে থেকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল আলোকচিত্রের মানুষটিকে—হাসিখুশি এক যুবক ; প্রসন্ন দৃষ্টি, সুপুরুষ।

সীমার মা মৃদুস্বরে বললেন, "সীমার বাবা।"

—"মহাদেব চৌধুরির অল্প বয়সের ছবি ?"

—"নিতান্ত অল্প বয়সের নয়। ওঁকে দেখলে বয়স বোঝা যেত না।"

একটা ছোট পাত্রের উপর চায়ের কাপ আর ডিমভাজা নিয়ে প্রবেশ করল সীমা. "বিশেষ কিছু করতে পারি নি, শুধু ওমলেট আর চা।"

ওমলেটের প্লেট টেনে নিয়ে অঞ্জন বলল, "শুধু চা হলেই চলত, আর কিছু দরকার ছিল না। আপনি বরং সোয়েটারটা চটপট কাগজে মুড়ে নিয়ে আসুন।"

"এখনই আনছি," বলে সীমা আবার অন্তঃপুরে অদৃশ্য হল।

অমলেট শেষ করে সামনে ছোট টেবিলটার উপর থেকে চায়ের পেয়ালা তুলে নিল অঞ্জন। সীমার মায়ের দিকে চোখ না তুলেও সে অনুভব করছিল তাঁর দুই চোখের দৃষ্টি তার উপর স্থির হয়ে আছে...

অবশেষে এই অস্বস্তিকর স্তব্ধতা ভঙ্গ করার জন্যই অঞ্জন বলে উঠল, "বাড়িটায় শুধু আপনারা দু'জন মহিলা থাকেন, ভয় করে না ?"

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তাকেই হঠাৎ প্রশ্ন করলেন উদ্দিষ্ট মহিলা, "তোমার বাবার নাম কি ?"

অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন ! এবং অপ্রাসঙ্গিক। অঞ্জন চমকে বিষম খেল। পেয়ালা থেকে চা ছিটকে পড়ল। সীমা যখন ঘরে ঢুকল অঞ্জন তখন বিষম কাশছে।

হাতের প্যাকেট টেবিলের উপর রেখে সীমা বলল, "এই রইল আপনার সোয়েটার। কিন্তু এমন কাশছেন কেন ? বিষম লেগেছে মনে হচ্ছে ?"

কোন রকমে কাশির ধাক্কা সামলে অঞ্জন বলল, "হ্যাঁ, হঠাৎ বিষম খেয়েছি।"

তারপরই কব্জি ঘুরিয়ে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল, "ওঃ ! দশটা বাজে !"

টেবিলের উপর থেকে সোয়েটারের প্যাকেটটা তুলে নিয়ে অঞ্জন বলল, "এবার আমি চলি।"

উদ্বিগ্ন স্বরে সীমা বলল, "হ্যাঁ. বেশি রাত করা উচিত হবে না। শয়তানগুলোর খপ্পরে পড়তে পারেন। যে রাস্তা দিয়ে এসেছেন, ঐ পথে ফিরবেন না। আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলেই—"

"জানি, ডানদিকে বড় রাস্তা পাব," "অঞ্জন বলল, "তবে গুণ্ডাদের ভয় করি না। আজ রাতে অন্ততঃ ওরা আমার সামনে আসতে সাহস পাবে না।"

-"তবু সাবধানের মার নেই।"

"মারেরও সাবধান নেই ! যাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রায় প্রতি রাত্রেই আমাকে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষতে হয়, তাদের তুলনায় এই গুণ্ডারা নিতান্তই শিশু," "বলতে বলতেই অঞ্জনের মুখে এক অদ্ভুত হাসির রেখা ফুটল, "লোকদুটোর অবস্থা কি হয়েছে জানেন ? একজনের নাকের হাড় টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, কোন ডাক্তার ঐ হাড় জোড়া লাগাতে পারবে না। আর একজন সারা জীবন বুকের ব্যথায় কষ্ট পাবে। কোন ডাক্তারই ঐ ব্যথা সারিয়ে দিতে পারবে না। হয়তো"—

একটু হেসে অঞ্জন আবার বলল, "হয়তো ঐ বুকের ব্যথা তার আয়ুকেও কিছুটা কমিয়ে দিতে পারে। সেজন্য আমার দুঃখ নেই। দুনিয়া থেকে একটা পাপ তাড়াতাড়ি বিদায় নিলে সমাজের ভালো ছাড়া মন্দ হবে না।"

"আপনি সাংঘাতিক মানুষ তো!" সীমা বলে উঠল, "আপনাকে দেখলে কিন্তু বোঝাই যায় না যে, আপনি এমন ভীষণভাবে মারামারি করতে পারেন ! কিন্তু প্রতিরাত্রে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষতে হয় বললেন কেন ? আপনার এই কথার অর্থও কিছু বুঝতে পারলাম না। কি করেন আপনি ?"

"সব কথা কি চটপট বোঝা যায় ?" হাসতে হাসতে অঞ্জন বলল, "আপনার মাকে দেখলে কি বোঝা যায় যে, আপনার মতো একটি মেয়ের উনি মা হয়েছেন ? অপরিচিত মানুষ আপনাদের দেখলে ওঁকে আপনার দিদি বলেই ভাববে, মা বলে কখনই ভাবতে পারবে না।"

সীমার মা যেন একটু লজ্জিত হলেন, কিন্তু সীমা বলে উঠল, "কথাটা ঠিক। ছোটবেলা থেকেই মা নাকি অসাধারণ সুন্দরী। তাই তো দাদু নাম রেখেছিলেন শ্রীময়ী।"

"আপনার মা সার্থকনামা মহিলা। বয়েস তাঁর সৌন্দর্যে এখনও হাত ছোঁয়াতে পারে নি, "অঞ্জন বলল, তারপর সীমার দিকে তাকিয়ে হাসল, "আপনার মায়ের থেকেই এমন চেহারা পেয়েছেন আপনি।"

"কী যে বলেন," "সীমা হাসল, "মায়ের সঙ্গে আমার তুলনাই চলে না।"

"খুব হয়েছে," কপট ক্রোধে মেয়েকে ভর্ৎসনা করলেন শ্রীময়ী, "আর মায়ের রূপবর্ণনা করতে হবে না।"

তারপর হঠাৎ অঞ্জনের দিকে ফিরে বললেন, "কথায় কথায় রাত হয়ে গেল। আর তোমায় আটকাব না। কিন্তু কাজল, তোমার বাবার নামটা তো বললে না?"

"বাবার নাম, বাবার নাম—কিন্তু আমার নাম তো কাজল নয়," বিস্মিত কণ্ঠে অঞ্জন বলল, "আপনি আমায় কাজল বলে ডাকলেন কেন?"

"শুদ্ধ ভাষায় যাকে অঞ্জন বলে, চলতি ভাষায় তাকেই তো কাজল বলে, তাই নয় কি?" শ্রীময়ী হাসলেন, কিন্তু তাঁর চোখের দৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠল, "আসল কথাটা চাপা পড়ে যাচ্ছে। বাবার নামটা বলতে কি তোমার আপত্তি আছে?"

"না, না, আপত্তি থাকবে কেন?" শ্রীময়ীর চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিল অঞ্জন, মুখ নিচু করে বলল, "বাবার নাম বিশ্বনাথ ঘোষ।"

কয়েকটি নীরব মুহূর্ত। সীমার মনে হল তার অলক্ষ্যে কি যেন একটা ব্যাপার ঘটে গেল।

স্তব্ধতা ভঙ্গ করল অঞ্জন, "অনেক দেরি হয়ে গেল। অনুমতি করুন, আজ আমি যাই।"

শ্রীময়ী কিছু বলার আগেই সীমা বলে উঠল, "যাই বলতে হয় না, বলুন আসি। কিন্তু আবার কবে আসবেন বলে যান।"

"হ্যাঁ, তা আসব, সুযোগ পেলেই আসব," স্খলিত স্বরে অঞ্জন বলল, "তবে কবে আসতে পারব বলতে পারি না।"

—"ছুটির দিনে আসলে ভালো হয়। মানে শনি, রবিবার। অন্যান্য দিন স্কুল থাকে, বিকেলে ছাত্রী পড়িয়ে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যায়। রাতে এলে তো বেশীক্ষণ থাকতে পারবেন না। আমি আসছে রবিবার সকালে আপনাকে আশা করব।"

অঞ্জন উত্তর দেওয়ার আগেই শ্রীময়ী বলে উঠলেন, "তোমার যখন খুশি চলে এস। সীমা না থাকলেও আমাকে সারাদিনই তুমি বাড়িতে পাবে। আসবে তো কাজল?"

"আসব," অঞ্জন হেসে ফেলল, "কিন্তু আপনি কি আমায় কাজল বলেই ডাকবেন না কি?"

শ্রীময়ীও হাসলেন, "যদি তোমার আপত্তি না থাকে।"

অঞ্জন এইবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে শ্রীময়ীর দিকে তাকাল।

চোখে চোখ পড়ল। শ্রীময়ী চোখ ফিরিয়ে নিলেন না।

অস্ফুট স্বরে কি যেন বলল অঞ্জন, তারপরই হঠাৎ নিচু হয়ে শ্রীময়ীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে খোলা দরজা দিয়ে বাইরের অন্ধকার রাস্তায় মিলিয়ে গেল।

এমন আকস্মিক প্রস্থান শ্রীময়ী ও সীমার কল্পনার বাইরে, দু'জনেই কেমন যেন হকচকিয়ে গেলেন। বিস্ময়ের ধাক্কাটা মেয়ের আগে মাই প্রথম সামলে নিলেন, দরজার সামনে দ্রুতপদে এগিয়ে এসে বাইরে দৃষ্টিপাত করলেন শ্রীময়ী। দূরে মোড়ের মাথায় বড় রাস্তার দিকে অঞ্জনের দেহটা অন্তর্ধান করার আগে কয়েক মুহূর্তের জন্য তাঁর দৃষ্টিগোচর হল...

হঠাৎ মেয়ের ডাকে সংবিৎ ফিরে পেলেন শ্রীময়ী, "মা, ওখানে কি দেখছ? এদিকে দেখ, অঞ্জনবাবু তাঁর মানিব্যাগটা ফেলে গেছেন।"

শ্রীময়ী ফিরে দেখলেন মেয়ে একটা মানিব্যাগ নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। কয়েক মুহূর্ত পরেই আবার চেঁচিয়ে উঠল সীমা, "উরি ব্বাস! এত টাকা! উনি তো ব্যবসায়ী ন'ন, শুনেছি দিল্লির এক সওদাগরি অফিসে চাকরি করেন। এত টাকা নিয়ে উনি ঘোরাঘুরি করেন কেন?"

ব্যাগ খুলে একতাড়া নোট বা'র করল সীমা। গুণে দেখল পাক্কা বারোশো টাকা রয়েছে।

টাকাগুলো সন্তর্পণে ব্যাগের মধ্যে রাখতে রাখতে সে বলল, "দেখি ভিতরে যদি ঠিকানা লেখা কার্ড পাওয়া যায়।"

পাওয়া গেল। তবে ঠিকানা লেখা কার্ড নয় বা কাগজ নয়, একটি ছোট পাসপোর্ট সাইজের ফটোগ্রাফ। চোদ্দ কি পনের বছরের একটি কিশোরের প্রতিচ্ছবি, সময়ের প্রলেপে ঈষৎ বিবর্ণ।

দেখতে দেখতে সীমা বলে উঠল, "ভারি সুন্দর, তাই না মা?"

সত্যিই সুন্দর। একমাথা কোঁকড়া চুলে-ঘেরা মুখখানা মুহূর্তেই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছবিখানা দেখতে দেখতে হঠাৎ শ্রীময়ীর দুই চোখ প্রখর হয়ে উঠল, মেয়ের হাত থেকে টেনে নিয়ে তিনি সেটিকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন।

"তুমি যে ফটো দেখতে দেখতে ধ্যানমগ্ন হয়ে গেলে মা," সীমা হেসে উঠল, "দাও, ওটা ব্যাগের ভেতরেই রেখে দিই।"

সীমার প্রসারিত হাত ঠেলে দিয়ে শ্রীময়ী বললেন, "এটা আমার কাছেই থাক।"

মেয়ের হাত থেকে মানিব্যাগটাও টেনে নিলেন তিনি, "এটা আমার কাছে রইল। সংসারের নানা প্রয়োজন রয়েছে। আসছে মাসে তোর দুটো টিউশানি থাকছে না। টাকাটা হয়তো দরকার হবে।"

"তুমি বলছ কি!" সীমা ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠল, "অঞ্জনবাবু যখন ফিরে এসে ব্যাগের কথা জিজ্ঞাসা করবেন, কি বলব? বলব, পাইনি? ছি, ছি, তোমার কি হয়েছে বলতো? অভাব-অভিযোগ থাকলে কি আমরা চুরি করব?"

—"চুরির প্রশ্ন আসছে কেন? অস্বীকারই বা করব কেন?"

—"তাহলে কি ভিক্ষার দান বলে টাকাটা গ্রহন করতে হবে ?"

"তোমাকে কিছুই বলতে হবে না বাছা," শ্রীময়ীর কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট বিরক্তি, "কাজল যদি ফিরে আসে, যা বলার আমিই বলব। তবে জেনে রাখো, সে আর আসবে না। ওটা সে ভুল করে ফেলে যায় নি, গোপনে রেখে গেছে।"

একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়ে সীমা বলল, "কেন ? উনি শুধু-শুধু দু'জন প্রায়-অপরিচিত মহিলাকে অতগুলো টাকা দান করতে যাবেন কেন ? আমরাই বা সে টাকা নেব কোন অধিকারে ?"

মুখ টিপে হেসে শ্রীময়ী বললেন, "ভালোবাসার অধিকারে।"

"ভালোবাসার অধিকার !" সীমা এত বেশী অবাক হয়ে গেল যে, কিছুক্ষণ কথাই কইতে পারল না।

বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে নিয়ে সীমা তিক্তস্বরে বলল, "মা, তোমার আজকের কথাবার্তা আর ব্যবহারে আমি অবাক হয়ে গেছি। অঞ্জনের অর্থ যে কাজল সেটা অনেকেই জানে, কিন্তু হঠাৎ ওঁকে 'কাজল' বলে ডেকে রসিকতা করতে গেলে কেন ? না, কি, তুমি যে একজন বিদুষী মহিলা সেটাই ওঁকে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলে ? সদ্য-পরিচিত এক ভদ্রলোকের সঙ্গে এই ধরণের রসিকতা ছ্যাবলামি ছাড়া আর কিছুই নয়। ছি ! ছি ! তোমার কি হঠাৎ মাথা খারাপ হয়ে গেল ?"

শ্রীময়ী মেয়ের কথার জবাব দিলেন না, কিন্তু তাঁর চোখে-মুখে ক্রোধের ছায়া পড়ল।

মায়ের নীরব ক্রোধকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সীমা আবার বলে উঠল, "তুমি যে ভিতরে ভিতরে জ্যোতিষ-চর্চা করছ, তা তো জানতাম না। ভদ্রলোক আর আসবেন না তুমি জানলে কি করে ?"

"সীমা !" শ্রীময়ী কঠিন স্বরে বললেন, "লেখাপড়া তোমার চাইতে আমি কিছু কম করি নি। ডিগ্রীটাই শিক্ষার মাপকাঠি নয় তবু সেই ডিগ্রীর হিসাবেও আমার ওজন তোমার চাইতে বেশী তুমি বাংলায় বি· এ· পাশ করে মিঃ মুখার্জির সুপারিশের জোরে চাকরিটা পেয়ে গেছ। আমি ইংলিশে এম· এ· হয়েও বাড়িতে বসে আছি—কারণ, তোমার বাবা কোনদিনই আমার চাকরি করাটা পছন্দ করতেন না। তবে লোকের কাছে, বিশেষ করে সদ্যপরিচিত ভদ্রলোকের কাছে বিদ্যা জাহির করার মতো তরলচিত্তের মেয়ে আমি নই। তোমরা শিক্ষার গর্ব করো, কিন্তু গুরুজনের সম্মান রেখে কথা বলতে পর্যন্ত জানো না। এই তোমাদের শিক্ষা ?"

সীমা দেখল মায়ের মুখ রাগে লাল হয়ে উঠেছে, সে সভয়ে বলে উঠল, "মা।"

ভয় পাওয়ার কারণ ছিল। শ্রীময়ী সহজে রাগ করেন না, কিন্তু একবার ক্ষেপে গেলে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। একেবারে নির্জলা উপবাস ঘোষণা করে বসে থাকেন। তখন সীমাকেই ঘাট মেনে হাতে-পায়ে ধরে মাকে খাওয়াতে হয়। আবার সেই রকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়ার আশঙ্কায় সীমার মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে শ্রীময়ী উদ্যত ক্রোধ দমন করলেন, সংযত স্বরে বললেন, "তোমার জন্মের আগে অনেকগুলো বছর গড়িয়ে গেছে, আর সেই সময় অনেক ঘটনাও ঘটে গেছে। সেসব কথা এখনই তোমাকে জানানোর প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। আমার ব্যবহারে আজ যদি কোন অসঙ্গতি দেখে থাকো, তাহলে তার যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে জানবে। এখন মাকে জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টা না করে খাওয়ার ব্যবস্থা করে আমাকে কৃতার্থ করো।"

সাধারণতঃ খাওয়ার ব্যবস্থা করেন মা, শরীর খারাপ হলে ভার পড়ে মেয়ের উপর। সীমা বুঝল, আজ শরীর নয়, মেজাজ বিগড়েছে. তাই এই নির্দেশ। সে নিঃশব্দে উঠে গেল খাওয়ার ব্যবস্থা করতে···

একটু পরে মাকে ডাকতে এসে সীমা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাবার ফটোর তলায় এসে দাঁড়িয়েছেন মা, স্বামীর প্রতিকৃতির দিকে তাকিয়ে কি যেন বলছেন তিনি। কয়েকটা কথা সীমার শ্রুতি-গোচর হল, "সব যখন শেষ হয়ে গেছে বলে মনে হল, তখনই কি আমায় পরীক্ষা করার জন্য নিয়তির এই খেলা ! বিশ বছর পার হল না মাত্র কয়েকদিনের জন্য ! আর দিন সাতেক পরেই সীমার জন্মদিন। তবে আমি প্রতিজ্ঞা পালন করব···নিশ্চয়ই তোমার কথা রাখব··

পরের কথাগুলো ভালো করে বুঝতে পারল না সীমা। নিঃশব্দে সে আবার ফিরে গেল রান্নাঘরে। খাওয়ার ব্যাপারটা এই মুহূর্তে নিতান্তই স্থূল আর অপ্রয়োজনীয় মনে হল। চির-পরিচিতা মা যেন হঠাৎ রহস্যময়ী হয়ে উঠেছেন আজ !

পরবর্তী সংখ্যায়
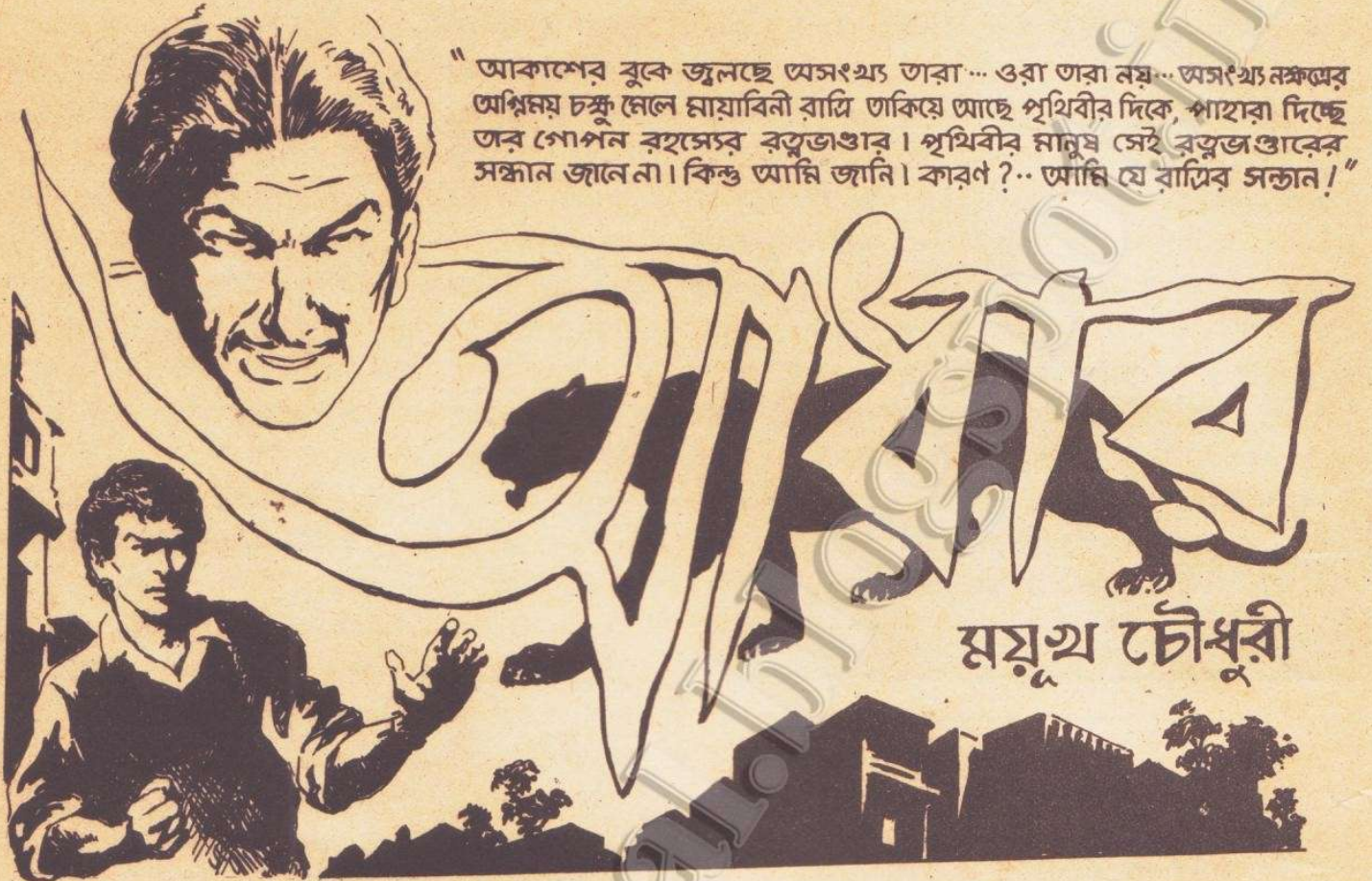
চতুর্থ পরিচ্ছেদ ● "আমি রাত্রির সন্তান !"

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

● "আমি রাত্রির সন্তান!" ●

—"আরও দু'টুকরো বরফ ফেলে দাও।"

—"আরে ব্বাস্!"

বেয়ারার অস্ফুট উক্তি অঞ্জনের কানে এল। সে হাসি চেপে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

খরিদ্দারের আদেশ পালন করার জন্য বেয়ারা পা বাড়াল, সঙ্গে সঙ্গে অঞ্জনের পিছন থেকে একটা অপরিচিত কণ্ঠ সকৌতুকে বলে উঠল, "আরে ভাই, চমকে যাচ্ছ কেন? অবশ্য চমকে যাওয়াই স্বাভাবিক, এমন দারুণ ঠাণ্ডা কলকাতা শহরে কয়েক বছরের মধ্যে পড়ে নি। তবে উনি বহুদিন ইউরোপের নানা জায়গায় ঘুরেছেন, তাই এই ঠাণ্ডা ওঁর গায়েই লাগছে না। ওঁর গেলাসের জিনিস একটু বেশি ঠাণ্ডা হওয়া দরকার।"

চমকে উঠে পিছন ফিরে তাকাল অঞ্জন, দেখল তার পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে এক দীর্ঘকায় পুরুষ। লোকটির দেহে ইউরোপীয় পরিচ্ছদ—গায়ের ফর্সা রং রোদে পুড়ে তামাটে, রোমশ জোড়া ভুরু নিচে একজোড়া ঝকঝকে কালো চোখ, সরু গোঁফ আর মাথায় লালচে-বাদামী চুলের মাঝখানে সিঁথি দেখে বাঙ্গালী তো দূরের কথা ভারতীয় বলেই মনে হয় না। চেহারা দেখে যা-ই মনে হোক, তার কথা শুনে তাকে খাঁটি বঙ্গসন্তান ছাড়া আর কিছু ভাবা অসম্ভব।

সীমা আর শ্রীময়ীর কাছে বিদায় নিয়ে অঞ্জন চলে এসেছিল চৌরঙ্গী এলাকায়। অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করছিল সে, মাথার ভিতরটা দপ্ দপ্ করছিল। একটা রেস্তরায় ঢুকে বেয়ারাকে ঠাণ্ডা পানীয় পরিবেশনের ফরমাশ করল সে। বেয়ারা হুকুম তামিল করেছিল। কিন্তু ঠাণ্ডা পানীয়কে 'আরও-ঠাণ্ডা' করার জন্য বরফ দেয় নি। এই নিদারুণ ঠাণ্ডায় কোন খরিদ্দার যে বরফ চাইতে পারে, তা সে ভাবতেই পারে নি। তবু দু'টুকরো বরফ দেওয়ার পরেও খরিদ্দারটি যখন আরও বরফ চাইল, তখনই তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল অস্ফুট স্বগতোক্তি, "আরে ব্বাস্!" আর তখনই হল অপরিচিত আগন্তুকের আবির্ভাব! পরবর্তী ঘটনা আগেই বলা হয়েছে, পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

অঞ্জনের বিস্ময়টুকু উপভোগ করতে করতে আগন্তুক বলল, "আমি কি এখানে বসতে পারি, মিঃ চৌধুরী?"

লোকটির ঠোঁটের কোনায় মৃদু হাসি;— অঞ্জনের মনে হল সেই হাসির আড়ালে লুকিয়ে আছে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ!

শিষ্টাচারের নিয়ম পালন করলেও আগন্তুক অনুমতির অপেক্ষা করল না, মুখোমুখি একটা চেয়ার টেনে আসন গ্রহণ করল হাসিমুখে।

"মিঃ চৌধুরী, বোধহয় চমকে গেছেন?"

—"আপনি আমাকে চেনেন?"

—"চিনি বৈকি!"

—"কিন্তু আমি তো আপনাকে চিনি না।"

—"স্বাভাবিক।"

—"তার মানে? আমি আপনাকে চিনি না, অথচ আপনি আমায় চেনেন, এটা স্বাভাবিক ব্যাপার বলতে চান?"

—"কেন নয়? বিখ্যাত ব্যক্তিদের সাধারণ মানুষ দেখলেই চিনতে পারে, কিন্তু তাঁরা কি সাধারণ মানুষকে চেনেন? যে-সব অভিনেতা বা খেলোয়াড় খ্যাতিলাভ করেছেন, সারা দেশের রাম, শ্যাম, যদু, মধু অথবা টম, ডিক, হ্যারি তাঁদের দেখলেই চিনতে পারে, কিন্তু ঐসব বিখ্যাত ব্যক্তিরা কি তাঁদের ভক্তবৃন্দের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হতে পারেন?"

"ওঃ!" অঞ্জনের ললাট রেখাগুলো মিলিয়ে গেল, "তাই বলুন, আপনি আমার খেলা দেখেছেন। তাহলে বলব, আপনার স্মৃতিশক্তি খুবই প্রখর। কারণ, মাঝখানে আমি বেশ কয়েক বছর ছুটি নিয়েছিলাম—বছর তিনেক আগে আমার খেলা দেখেছিলেন হয়তো। আজ এতবছর বাদে পৃথিবীর এক ভূখণ্ড ছেড়ে অপর ভূখণ্ডে এসেও আপনি যে আমায় দেখামাত্র চিনতে পেরেছেন, সেটা খুবই আশ্চর্য ব্যাপার। খেলোয়াড় যখন দেখে তার খেলা মানুষকে আকর্ষণ করছে, তখনই সে সমস্ত কষ্ট আর পরিশ্রম সার্থক মনে করে। দর্শকের স্বীকৃতি খেলোয়াড়, অভিনেতা বা শিল্পীর কাছে সবচেয়ে বড় পুরস্কার। আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার ফলে আমি যে কত খুশি হয়েছি, সেকথা বুঝিয়ে বলতে পারব না। কিন্তু আমার খেলা কোথায় দেখেছেন? ইউরোপের কোন্ দেশে? নাকি, আমেরিকায়!...হাসছেন? তবে কি জাপানে?"

—"সর্বত্র।"

—"বলেন কী!"

—"ঠিকই বলছি, মিঃ চৌধুরী।"

অঞ্জনের ললাটে আবার রেখা পড়ল, "ভুল করছেন বোধহয়। আমি চৌধুরী নই, ঘোষ। অঞ্জন ঘোষ।"

আগন্তুক হাসল, "হ্যাঁ, ঐ নামেই পরিচয় ঘোষণা করা হয়েছিল বটে।"

"আপনি কি বলতে চান?" অঞ্জনের কণ্ঠস্বরে বিরক্তির আভাস বেশ স্পষ্ট, "বলতে চান পদবীটা ভুয়ো, মিথ্যা? ঠারে-ঠোরে আপনি যেন সেইরকম ইঙ্গিত দিচ্ছেন বলেই মনে হচ্ছে!"

—"পদবীটা সত্য। কিন্তু—"

—"কিন্তু বলে থামলেন কেন?"

—"কিন্তু অশ্বত্থামা হত, ইতি গজ!"

—"দেখুন মিঃ"—

—"আপনি আমায় জোসেফ বলে ডাকতে পারেন।"

—"মিঃ জোসেফ! এর আগে আপনাকে আমি কখনও দেখি নি। আপনি হয়তো বিদেশে কোথাও আমার খেলা দেখেছেন। ভালো লেগেছে তাই মনেও রেখেছেন। সেজন্যে আমি খুবই আনন্দিত। কিন্তু আপনি এমন উল্টোপাল্টা কথা বলছেন যে—"

বাধা দিয়ে আগন্তুক বলল, "আমি উল্টোপাল্টা বলছি না, সেকথা আপনি ভালো করেই জানেন।"

"আপনি আমায় দস্তুর মতো বিরক্ত করছেন," হাতের গেলাসে একটা লম্বা চুমুক দিল অঞ্জন, "এবার আমি উঠব।"

"উঠবেন না, মিঃ চৌধুরী," আগন্তুকের কণ্ঠস্বর গম্ভীর, "আপনার সামনে মস্ত বিপদ। আগামী রাত্রের কথাটা কি ভুলে গেছেন?"

চমকে উঠল অঞ্জন, সামনে ঝুঁকে পড়ে প্রায়-অবরুদ্ধ স্বরে বলে উঠল, "কোন্ বিপদের কথা বলছেন?"

"ব্রেজিল থেকে যে-বিপদ আপনি আমদানী করেছেন," আগন্তুক অঞ্জনের চোখে চোখ রাখল, "আমি সেই বিপদের কথাই বলছি।"

—"ক-ক-কী! আর একটু খুলে বলুন। মিঃ জোসেফ, মনে হয় আপনি খৃষ্টান। আপনাদের ঈশ্বরের দোহাই, খুলে বলুন আপনার বক্তব্য।"

—"আমি খৃষ্টান নই। কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই দিলে শয়তান ক্ষমা করে না।"

—"কী বললেন?"

এক চোখ টিপে হাসল জোসেফ, "বলছিলাম ঈশ্বরের দোহাই দিলে শয়তান ক্ষমা করবে কি?"

অঞ্জন চট্ করে জোসেফের একটা হাত চেপে ধরল।

জোসেফ হাসল, "ইঙ্গিতটা তাহলে বুঝেছেন? কিন্তু অতজোরে হাত চাপবেন না। আমার কবজিটা লোহা দিয়ে তৈরি নয়, ভেঙ্গে যেতে পারে। আমি আপনার শত্রু নই—বন্ধু।"

"দুঃখিত, মাফ করবেন," লজ্জিত হয়ে হাত ছেড়ে দিল অঞ্জন, "আপনি কিন্তু এখন পর্যন্ত বন্ধুত্বের প্রমাণ দেন নি, ক্রমাগত রহস্যের সৃষ্টি করে আমার মনে উদ্বেগ ও আশঙ্কার সৃষ্টি করছেন।"

—"রহস্যের সৃষ্টি যদি করে থাকি, সমাধানও আমিই করব। একটা কথা বলছি, শুনুন;—আপনার সামনে যে ভয়ংকর বিপদ এগিয়ে আসছে, তার সম্পর্কে আপনি এখনও অবহিত নন।"

—"যে-ভাবেই হোক, ব্যাপারটা আপনি জেনেছেন। তবে এটাকে আপনি যতটা বিপজ্জনক ভাবছেন, আমার কাছে ব্যাপারটা অত গুরুতর নয়। শেষ মুহূর্তে যদি গোলমাল হয়, সামাল দেওয়ার মতো শারীরিক ক্ষমতা আমার আছে জানবেন। তবে মানসম্মানের প্রশ্নটা থেকেই যায় আর সেটাই আমার কাছে অত্যন্ত গুরুতর।"

—"মান নয়, প্রাণ নিয়েই হয়তো টানাটানি পড়তে পারে। মৃত্যু এখানে রক্তাক্ত হিংস্রতার চেহারা নেবে না, ধীরে ধীরে আপনাকে গ্রাস করবে নিঃশব্দে!"

—"মিঃ জোসেফ! আপনার কথা আমি এতক্ষণ বুঝতে পারছিলাম, কিন্তু আবার আপনি হেঁয়ালির সৃষ্টি করছেন।"

"মিঃ চৌধুরী!" জোসেফ গম্ভীর কণ্ঠে বলল, "সমস্ত ব্যাপারটা আপনাকে খুলে বলতে গেলে সময় লাগবে, এই স্থানও তার উপযুক্ত নয়। তবে এইটুকু বলতে পারি, আপনার অবস্থা হয়েছে কথামালার একচক্ষু হরিণের মতো। মৃত্যু যেদিক থেকে আসছে, সেদিকটা আপনি দেখতেই পাচ্ছেন না;—তাই বিপদের গুরুত্বও বুঝতে পারছেন না। আপনি যে বিপদের কথা ভাবছেন, সেই বিপদে আপনার প্রাণসংশয় হতে পারে বটে, কিন্তু সেজন্যে আপনি দেহে-মনে প্রস্তুত। অতএব অসম্মানিত হলেও প্রাণহানি হয়তো ঘটবে না, এই ক্ষেত্রে মৃত্যুকে হয়তো আপনি এড়িয়ে যাবেন। কিন্তু বর্তমান সমস্যাকে কেন্দ্র করেই সম্পূর্ণ অন্যদিক থেকে আপনার দিকে এগিয়ে আসছে ছদ্মবেশী মৃত্যু—তার কবল থেকে আপনি উদ্ধার পাবেন কি করে? তাকে তো আপনি চেনেন না!"

অঞ্জন আর বিরক্তি গোপন করার চেষ্টা করল না, উষ্ণস্বরে বলে উঠল, "আপনি যখন ব্রেজিলের আমদানী-করা বিপদের কথা বলছেন, তখন আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি। অন্য কোনও বিপদের কথা আমি জানি না।"

—"আমি জানি।"

—"বেশ, বলুন। আমি শুনছি।"

—"বলবার কিছু নেই, শুনবার কিছু নেই, শুধু দেখার আছে।"

—"বিপদের স্বরূপ দেখার জন্য আপনার সঙ্গে আমি কোথাও যেতে রাজী নই।"

"কোথাও যেতে হবে না, এই ঘরে বসেই আপনি সব দেখতে পাবেন, সব জানতে পারবেন।" জোসেফ তার বাঁ হাতটা টেবিলের উপর মেলে দিল, উপুড় করে আঙুলগুলো প্রসারিত করল অঞ্জনের চোখের সামনে, "প্রাণঘাতী বিপদের চেহারাটা দেখে নিন।"

অসতর্ক পথিক পায়ের কাছে হঠাৎ সাপ দেখলে যে-ভাবে চমকে ওঠে, ঠিক সেইভাবে চমকে উঠল অঞ্জন, "কে তুমি?"

জোসেফ হাসল, "উত্তেজিত হবেন না। লোকে শুনছে।" কথাটা সত্যি। অঞ্জনের উত্তেজিত তীব্রস্বর কয়েকজন খরিদ্দারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। দু'জন বেয়ারাও থমকে দাঁড়িয়েছে, তাদেরও চোখ পড়েছে অঞ্জন আর জোসেফের দিকে।

মুহূর্তের মধ্যে কণ্ঠস্বর সংযত করে নিল অঞ্জন, "ক্ষমা করবেন, কিন্তু আপনি কে? দৈবজ্ঞ মহাপুরুষ?—না, শয়তানের মন্ত্রশিষ্য? কে আপনি?"

টেবিলের পাশেই জানালা। সেই জানালা দিয়ে দূর আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল জোসেফ, "মিঃ চৌধুরী, কী দেখছেন ওখানে?"

—"কী দেখব? অন্ধকার আকাশ, আবার কী!"

—"শুধু আকাশ? শুধু অন্ধকার? আলোর ফুলকিগুলো দেখতে পাচ্ছেন না?"

—"পাচ্ছি। অন্ধকার আকাশে জ্বলছে অসংখ্য তারা। নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। ওখানে দেখার কি আছে?"

"নির্বোধ মানুষ শুধু তারা দেখবে," জোসেফ হাসল, পরক্ষণেই মুছে গেল হাসির রেখা তার ওষ্ঠাধর থেকে, ঝকঝকে কালো চোখ থেকে বিদায় নিল জীবনের উজ্জ্বল দীপ্তি; ম্লান স্তিমিত দৃষ্টি আকাশের দিকে সঞ্চালিত করল জোসেফ, তারপর গভীর স্বরে বলল, "ওরা তারা নয়।"

—"তারা নয়? তাহলে ওগুলো কি?"

—"ওরা তারা নয়। অসংখ্য নক্ষত্রের অগ্নিময় চক্ষু মেলে মায়াবিনী রাত্রি তাকিয়ে আছে পৃথিবীর দিকে, পাহারা দিচ্ছে তার গোপন রহস্যের রত্নভাণ্ডার। মানুষের পার্থিব চক্ষু রাত্রির অন্ধকার অঞ্চল ভেদ করে সেই অমূল্য রত্নভাণ্ডারের অস্তিত্ব আবিষ্কার করতে পারে না। কিন্তু আমি পারি।"

—"আপনি পারেন? কেমন করে? আপনি কি পৃথিবীর মানুষ নন?"

—"হ্যাঁ, আমিও পৃথিবীর মানুষ। তবে আমার কথা স্বতন্ত্র। অগণিত নক্ষত্রের আগুন-জ্বালা চোখে মায়াবিনী রাত্রি যা দেখতে পায়, মাত্র দুটি চোখ দিয়েই আমিও তাই দেখতে পাই। কারণ?—আমি যে রাত্রির সন্তান!"

স্তম্ভিত অঞ্জন সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে রইল উপবিষ্ট মানুষটির দিকে!... জোসেফের মুখ পাথরের মতো ভাবলেশহীন নিষ্প্রাণ... দুই চোখের উদাস দৃষ্টি হারিয়ে গেছে অন্তহীন আকাশের অন্ধকারে...

আচম্বিতে উচ্চকণ্ঠের বচসা ও কোলাহলে ফিরে এল আচ্ছন্ন চেতনা, সচমকে মুখ তুলে অঞ্জন দেখল দোকানের 'কাউন্টারে' ভিড় জমে উঠেছে একটি বিদেশী মানুষকে ঘিরে। লোকটির চেহারা দেখলেই বোঝা যায় সে ইউরোপ কিংবা আমেরিকার অধিবাসী। উক্ত বিদেশী ও দোকানের মালিকের ক্রুদ্ধকণ্ঠের

বাদানুবাদ ভেদ করে কলহের উৎস আবিষ্কার করা সম্ভব নয় তৃতীয় ব্যক্তির পক্ষে। হঠাৎ মালিকের ইঙ্গিতে একজন বলিষ্ঠ দর্শন বেয়ারা লোকটির ঘাড়ে হাত দিয়ে সজোরে ধাক্কা মারল এবং এক ধাক্কাতেই পৌঁছে দিল দরজার কাছে—

তার পরই অভাবিত কাণ্ড!

রবারের 'বল' দেখালে ছুঁড়লে যে ভাবে ঠিকরে ফিরে আসে, ঠিক সেইভাবেই ফিরে এল লোকটি তার আক্রমণকারীর দিকে! পরক্ষণেই চোয়ালের উপর পড়ল এক প্রচণ্ড ঘুষি এবং আক্রমণকারী বেয়ারা হল ভূমিশয্যায় লম্বমান! হৈ হৈ! গণ্ডগোল! ধুন্ধুমার!···

"ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না," অঞ্জন ক্রুদ্ধস্বরে বলল, "কিন্তু অতগুলো লোক মিলে একটা লোককে মারছে এই দৃশ্য অসহ্য।"

সে এগিয়ে যাওয়ার উপক্রম করতেই বাধা পড়ল। তাকে ঠেলে সরিয়ে সামনে এগিয়ে এল জোসেফ, "না, মিঃ চৌধুরী, আপনি ঝামেলা করবেন না। ব্যাপারটা আমি সামলাতে পারব।"

লম্বা লম্বা পা ফেলে কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেল জোসেফ—সেখানে তখন বিদেশী মানুষটি লড়াই করছে সপ্তরথী-বেষ্ঠিত অভিমন্যুর মতো!···

পরবর্তী সংখ্যায়
পঞ্চম পরিচ্ছেদ ● বার্তা
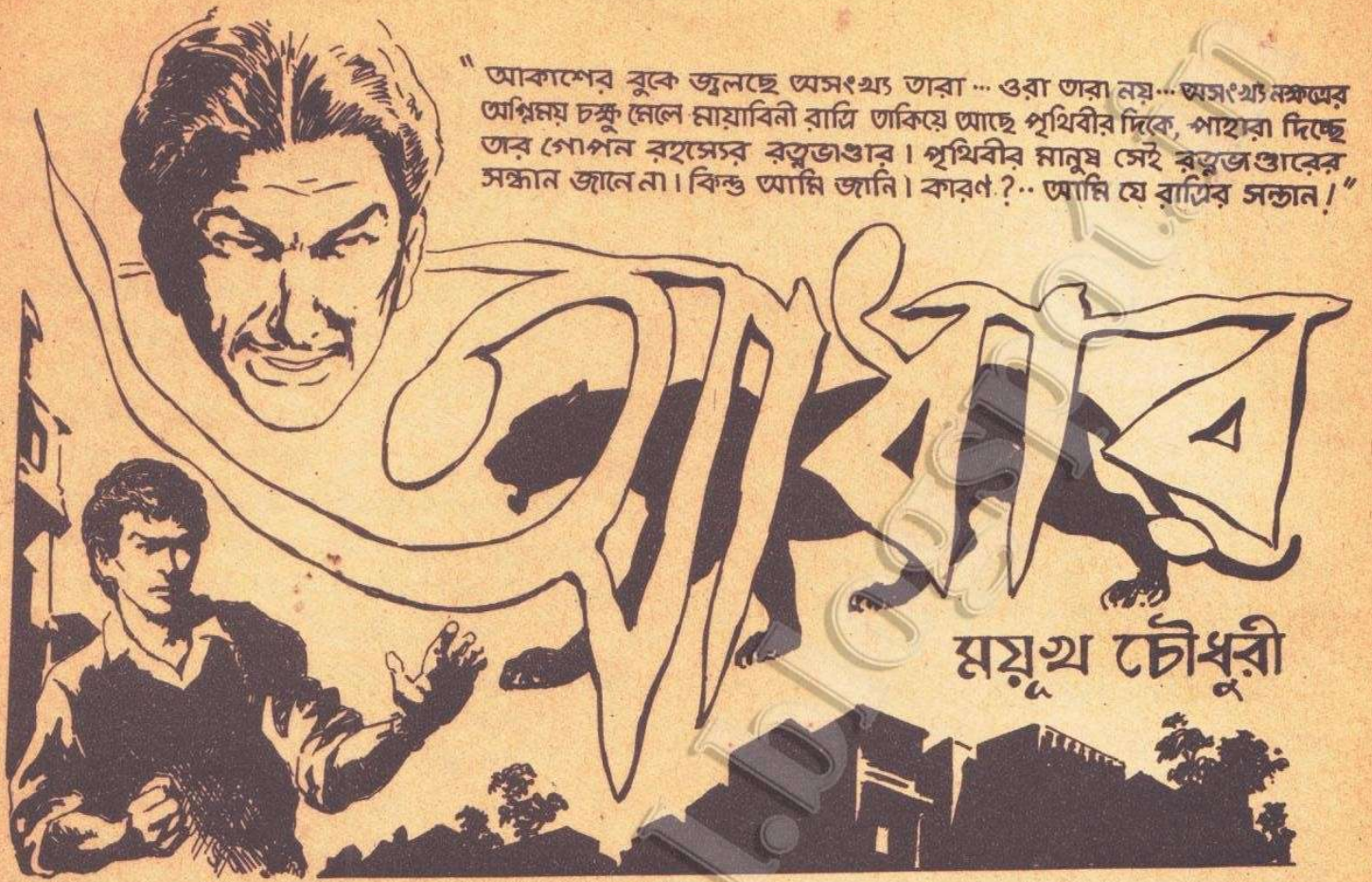
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বার্তা

কড়া ধরে একবার নাড়তেই দরজাটা সশব্দে খুলে গেল—"তুই কেমন মেয়ে রে ?" ক্রুদ্ধ স্বরে বলে উঠলেন শ্রীময়ী, "এই সেদিন এক কাণ্ড বাধিয়েছিলি, যদি কাজল না এসে পড়ত, তাহলে"—

"তাহলে কি হতো তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে আগে ঘরে ঢুকতে দাও," বলেই চট্ করে মায়ের পাশ কাটিয়ে সীমা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

দরজা বন্ধ করে পিছন ফিরলেন শ্রীময়ী, কিন্তু কিছু বলার আগেই মাকে জড়িয়ে ধরল সীমা, "লক্ষ্মীটি মা, বকাবকি কোরো না। আগে আমার কথা শোনো।"

"কী শুনব ?" শ্রীময়ী শক্ত গলায় বললেন, "তুই বলে গেছিস সাড়ে নয়টার মধ্যে নিশ্চয়ই ফিরবি আর এখন প্রায় এগারোটা বাজে ! আমার চিন্তা হয় না ? এত রাতে আবার যদি একটা দুর্ঘটনা ঘটত ? তোর সাহসকেও বলিহারি !"

একগাল হেসে সীমা বলল, "দুর্ঘটনা ঘটার কোন সম্ভাবনাই ছিল না যে। ছাত্রীর বাবা আমাকে তাঁর মোটরে বাড়ির দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেছেন।"

শ্রীময়ী মুখের কঠিন রেখাগুলো একটু নরম হল, "তুই বলে গেলি সাড়ে নয়টার মধ্যেই সার্কাস দেখে ফিরে আসবি। তোর ছাত্রীর সঙ্গে তার মা-বাবাও যাবেন শুনে আমি অনুমতি দিয়েছিলাম। কিন্তু রাত যখন এগারোটা, তখনও তোর পাত্তা নেই ! কাজেই দুশ্চিন্তা"—

বাধা দিয়ে সীমা বলে উঠল, "সেজন্য আমি দায়ী নই মা। তোমার কাজলই আমায় দেরি করিয়ে দিল। ছাড়তেই চায় না। তুমি বকাবকি করবে বলেছি, বলেছি, 'মা ভীষণ রাগ করবে।' হেসেই উড়িয়ে দিল, বলল, 'আমার কথা বললে মা কিছুই বলবেন না।'. হুঁ, তোমাকে তো চেনে না ! বাইরের লোকের কাছে তুমি চমৎকার মানুষ, আর আমাকে"—

"হ্যাঁ, তোমাকে আমি দিনরাত বকাবকি করছি, দাঁতে পিষছি," শ্রীময়ী হেসে ফেললেন, "নেমকহারাম মেয়ে ! তা কাজলকে তুই পেলি কোথায় ? ও সার্কাস দেখতে গিয়েছিল বুঝি ? এখানে আসতে বললি না কেন ?"

"বলেছি তো," সীমার হাসিমুখ গম্ভীর হল, "আমাকে অঞ্জন বাড়ির দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল, নামতে রাজী হল না।"

—"তবে যে বললি ছাত্রীর বাবা তাঁর মোটরে করে তোকে বাড়ী পৌঁছে দিয়েছেন ?"

—"ঠিকই বলেছি। ছাত্রীর বাবা-মা, আমার ছাত্রী, সবাই ছিল, সঙ্গে অঞ্জনও ছিল। তোমায় চমকে দেব বলে অঞ্জনের কথা আগে বলি নি। অঞ্জনের সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দিলাম, সেদিনের ঘটনার কথাও বললাম। শুনে সবাই অবাক হয়ে গেল। সকলে মিলে গল্প করতে করতেই রাত হয়ে গেল। আমার ছাত্রী রুণু তো অঞ্জনকে ছাড়তেই চায় না, তার কাছে অঞ্জন দস্তুরমতো 'হীরো' হয়ে গেছে।"

—"সব বুঝলাম। কিন্তু বুদ্ধি করে অঞ্জনের ঠিকানাটা নিতে পারলি না ?"

"ঠিকানা নেওয়ার দরকার নেই," সীমার কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক গম্ভীর, "সার্কাসে গেলেই তাকে পাওয়া যাবে। তবে যাওয়ার উপায় নেই।"

"সার্কাসে গেলেই পাওয়া যাবে ?" শ্রীময়ী বিস্মিতকণ্ঠে বললেন, "ও কি রোজ সার্কাস দেখতে যায় ? আশ্চর্য শখ তো ! সঙ্গী সাথীর দরকার নেই, আমিই তাহলে তোর সঙ্গে যাব। 'ইম্পিরিয়াল সার্কাস' তো এখন নিয়মিত চলছে।"

—"ইচ্ছে হলে তুমি যেতে পারো, আমি যাব না।"

—"কেন ? যাবি না কেন ?"

"আমায় যেতে বারণ করেছে," সীমার কণ্ঠ অভিমানে গাঢ় হয়ে এল, "বলেছে, 'তোমার ভালোর জন্যই বলছি, এখানে আর আসবে না। আমার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টাও কখনও করবে না।' আমি আর যাব না, মা। যে-লোক আমায় পছন্দ করে না, আমি তার ধারে-কাছে ঘেঁষি না। গুণ্ডার হাত থেকে বাঁচিয়েছে, সেজন্য চিরকালই তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব, কিন্তু তাই বলে আত্মসম্মান বিসর্জন দিতে রাজী নই।"

"না রে, সীমা," শ্রীময়ী সস্নেহে তাকালেন মেয়ের দিকে, "তোকে সে অপছন্দ করে না। বারণ করার নিশ্চয়ই অন্য কারণ আছে।"

"তুমি জানো না মা," সীমা উত্তেজিত হয়ে উঠল, "সে বলতে নিষেধ করেছিল। আমি সাফ বলে দিয়েছি, সে আমি পারব না, মায়ের কাছে আমি কোন কথাই লুকোই না। ফেলে-যাওয়া টাকার কথাও তাকে বলেছিলাম। উত্তরে কি বলল, জানো ?"

—"কী বলল ?"

—"লোকটা ভারি রুক্ষ। সোজা বলে দিল, 'টাকার দায়িত্ব যখন মা নিয়েছেন, ওটা নিয়ে আর তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না। টাকা আমার, রেখে দিয়েছেন তোমার মা—সুতরাং তুমি এখানে নিতান্তই তৃতীয় ব্যক্তি।'"

শ্রীময়ীর মুখে ফুটল স্নিগ্ধ হাসির রেখা।

—"তুমি হাসছ ? হাসবেই তো ! আমায় অপমান করলে তোমার তো ভালোই লাগে।"

"তাতো বটেই," শ্রীময়ী খোলাখুলি হেসে ফেললেন, "আমি তোমার শত্রু কি না, তোমায় অপমান করলে আমি খুশি হব বৈকি !"

—"আরও একটা ব্যাপার আমার ভালো লাগে নি। একদিনের পরিচয়, এমন কিছু ঘনিষ্ঠতা এখনও হয় নি—আমাকে দেখা হতেই 'তুমি' সম্বোধন করল। আমি নিতান্ত খুকী নই, অনুমতি না নিয়ে আমায় 'তুমি' বলবে কেন ?"

—"কাজল তোর চেয়ে বয়সে অনেক বড়। 'তুমি' বলেছে বলেই বুঝি মান গেছে ? তুই-ই বা অত বড় মানুষটাকে নাম ধরে কথা বলছিস কেন ? দাদা বলতে পারিস না ?"

—"বয়ে গেছে দাদা বলতে। তোমার কাজল মানুষ হিসাবে ভালো হতে পারে, কিন্তু ভারি অভদ্র।"

—"কেন ? তোর সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করেছে ?"

—"ঠিক তা নয়। এখান থেকে বিদায় নেওয়ার আগে হঠাৎ বলল, 'তুমি আমার সঙ্গে আর দেখা কোরো না। এখানেও আর এসো না।' তবে প্রথমে আমায় দেখে খুব খুশি হয়েছিল। হোটেলে নিয়ে গিয়ে সপরিবারে আমার ছাত্রীকে আর আমাকে দারুণ খাইয়ে দিল। প্রতিবাদ করেও লাভ হল না। আমি ছাড়া আর সবাই অঞ্জনকে দেখে মুগ্ধ, সে তো এখন সকলের চোখে 'হীরো'।"

—"হ্যাঁ, সেদিনের ব্যাপারটা শুনলে 'হীরো' মনে করা আশ্চর্য নয়।"

—"শুনে নয়, তাকে দেখেই সবাই চমকে গেছে।"

—"এটা আবার বাড়াবাড়ি হয়ে গেল। অঞ্জনকে দেখে চমকে যাওয়ার কিছু নেই।"

—"অঞ্জনকে দেখে নয়, তার খেলা দেখে সবাই চমকে গেছে।"

—"তার মানে ?"

—"অঞ্জন সার্কাসে ছিল বটে, তবে দেখতে নয়—দেখাতে ! সে ওখানে নিয়মিত খেলা দেখায়।"

—"তাই নাকি ? কীসের খেলা দেখায় ?"

—"বাঘ-সিংহ প্রভৃতি হিংস্র জানোয়ারের খেলা। বিশেষ করে একটা কালো বাঘকে নিয়ে সে যা কীর্তি করল, ভাবাই যায় না। জন্তুটাকে দেখলেই বুকের ভিতর ছাঁত করে ওঠে, কিন্তু অঞ্জন তাকে নিয়ে পোষা কুকুরের মতো খেলা দেখাল।"

"এটা মোটেই ভালো কথা নয়," শ্রীময়ী উদ্বিগ্ন স্বরে

বললেন, "আমি ওকে বারণ করে দেব। আর সীমা—তুই অঞ্জনকে নাম ধরে উল্লেখ করবি না, দাদা বলবি।"

—"বয়ে গেছে দাদা বলতে।"

"আজকালকার মেয়েগুলো যেমন অসভ্য, তেমনই উদ্ধত। লেখা পড়া শিখে সব জানোয়ার হয়েছে," শ্রীময়ী কঠিন স্বরে বললেন, "এবার এস। দুটো গিলে নিয়ে আমাকে ছুটি দাও। আমার ঘুম পেয়েছে।"

'আজকালকার মেয়ে' সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন শ্রীময়ী। সীমা বুঝল প্রতিবাদ নিষ্ফল, সে মাকে অনুসরণ করল নিঃশব্দে।

শিয়রে শমন

—"মা তোমারে এক সায়েব ডাকতিছে।"

—"সাহেব! সে কী রে!"

—"হ্যাঁ গো, মা। যাও না দেখে এস। কী সব কইছে, আমি বুঝতে নারি।"

মালতীর মায়ের মুখে হঠাৎ এক সাহেবের আগমন-সংবাদ শুনে শ্রীময়ী অবাক হয়ে গেলেন।

এখানে মালতীর মা নামক আধাবয়সী দাসীটির একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। মালতীর মা ঠিকা কাজ করে বিভিন্ন গৃহস্থের বাড়িতে। শ্রীময়ীর বাড়িতেও কাজ করে সে। সকাল-সন্ধ্যা এসে শ্রীময়ীর সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম করে দেয় সে, দুপুরে বা রাত্রে থাকে না। মালতী নামে কন্যাটির কথা আরও অনেকের মতো শ্রীময়ীরও শুনেছেন, কিন্তু স্বচক্ষে তাকে দেখার সৌভাগ্য তাঁর হয় নি। শুধু তিনি নন, কোনদিন কেউ মালতীর মায়ের মেয়েটিকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছে বলে শোনা যায় না। মেয়েটি নাকি তার মাসির বাড়িতে থাকে। তবে মেয়েটিকে না দেখলেই কন্যার নামেই 'বিখ্যাত' হয়ে গেছে মালতীর মা। অনেকের ধারণা মালতী নামে কোন মেয়ের অস্তিত্ব নেই—মেয়ের অসুখের নাম করে সময়-অসময়ে টাকা চাওয়ার জন্য আর কাজ কামাই করার ছুতো হিসাবেই ঐ মেয়েটিকে 'সৃষ্টি' করেছে মালতীর মা। শ্রীময়ীর সঙ্গে সেদিন সন্ধ্যার পর সুখ দুঃখের কথা কইতে

কইতে মালতীর মা ভাবছিল মেয়ের অসুখের নাম করে এস সময়ে দশটা টাকা চাইবে। মেয়ের অসুখের কথা শুনেও দশটা টাকা দেবেন না এমন কঠিন-হৃদয় মহিলা নন শ্রীময়ী, কিন্তু সম্প্রতি তিনি মালতীর অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠেছেন বলে মনে হয়—পর পর কামাই করার জন্য বিরক্তিও প্রকাশ করেছেন বহুদিন—অতএব টাকাটা পাওয়া যাবে কিনা সে বিষয়ে মালতীর মায়ের সন্দেহ ছিল যথেষ্ট। তবু কথা বলতে বলতে মনিবের মন বুঝে দশটা টাকার কথা পাড়বে বলে স্থির করেছিল মালতীর মা, হঠাৎ দরজার কড়া সশব্দে নড়ে উঠতেই সে দরজা খুলতে ছুটল। ফিরে এসে সে যা বলল, তা আগেই বলা হয়েছে, পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীময়ী এবার নিজেই অগ্রসর হলেন। শার্টপ্যান্ট আজকাল সবাই পরে, তাদের 'সায়েব' বলে ঘোষণা করে না মালতীর মা। বলে, 'একজন বাবু ডাকতিছে'। নয়তো বলে, 'প্যান্টেলুন পরা বাবু বা ছেলে।' হঠাৎ তার মুখে 'সায়েব' শুনে একটু অবাকই হয়েছিলেন শ্রীময়ী।

অপরিচিত আগন্তুককে ভিতরে বসতে বলে নি মালতীর মা, সে বাইরে অপেক্ষা করছিল।

দরজা খুলে আবছা আলো-আঁধারির মধ্যে লোকটিকে দেখলেন শ্রীময়ী। লম্বা চেহারা, পরণে নিখুঁত ইউরোপীয় পরিচ্ছদ, টুপির তলায় মুখের উপরিভাগ ছায়ার অন্ধকারে প্রায় অদৃশ্য— শুধু ধারালো নাক আর সরু গোঁফের নিচে একটা ক্ষীণ হাসির আভাস চোখে পড়ে।

শ্রীময়ী কোন প্রশ্ন করার আগেই নত হয়ে অভিবাদন জানাল আগন্তুক, "আমি নিশ্চয়ই মিসেস চৌধুরির সঙ্গে কথা বলছি ?"

লোকটি গায়ের রং আর চেহারা দেখে তাকে বাঙ্গালী বলে মনে হয় না, কিন্তু তার বাংলা কথা উচ্চারণে বিন্দুমাত্র জড়তা নেই।

বিস্ময় চাপা দিয়ে শ্রীময়ী বললেন, "হ্যাঁ, আমি মিসেস চৌধুরি। আমার কাছে আপনার কী দরকার ? আপনাকে কোনদিন দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না।"

আগন্তুকের ওষ্ঠাধরে হাসির রেখা বিস্তৃত হল, "না, আমরা কেউ কাউকে আগে দেখি নি।"

একটু ইতস্ততঃ করে শ্রীময়ী বললেন, "আপনি ভিতরে আসুন।"

"প্রয়োজন নেই," আগন্তুক বলল, "আমার বক্তব্য খুব সংক্ষিপ্ত। কথাটা বলেই চলে যাব।"

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলেন শ্রীময়ী।

"একটা অনুরোধ করছি," আগন্তুক একটু থামল, বোধহয় বক্তব্য বিষয় মনে মনে গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল, "আপনি কাজল চৌধুরির সঙ্গে কোনদিন দেখা করার চেষ্টা করবেন না। সে এখানে এলেও তাকে এড়িয়ে যাবেন। তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে আপনার ক্ষতি হতে পারে।"

শ্রীময়ী চমকে উঠলেন। তাঁর কান এবং মাথার ভিতর দিয়ে রক্ত চলাচল করতে লাগল দ্রুতবেগে। অপরিসীম বিস্ময় ও ক্রোধ সংবরণ করতে একটু সময় নিলেন তিনি, তারপর অনুচ্চ কঠিন স্বরে বললেন, "আমার ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আপনি কথা বলছেন কেন ? দেখুন, মিঃ"—

—"জোসেফ। আপনি আমায় জোসেফ নামেই সম্বোধন করতে পারেন।"

—"মিঃ জোসেফ, আপনার স্পর্ধা দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। সম্পূর্ণ অপরিচিত এক মহিলার ব্যক্তিগত ব্যাপারে আপনি কথা বলছেন কোন্ অধিকারে ? আমি কার সঙ্গে সম্পর্ক রাখব, আর কার সঙ্গে সম্পর্ক রাখব না, সেটা সম্পূর্ণ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।"

—"আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার যদি আমার ব্যক্তিগত স্বার্থে আঘাত করে, তখন বাধ্য হয়েই আমাকে আপনার ব্যাপারেও নাক গলাতে হবে। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি—কাজল চৌধুরির সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন না।"

"কারণটা কি ?" একটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ভেসে এল জোসেফের পিছন থেকে, "কাজল চৌধুরি মানুষটা কি খুব খারাপ ? খুনে-গুণ্ডা বা ডাকাত গোছের কিছু ?"

সচমকে পিছন ফিরেই দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল আগন্তুক, বিনীত হাস্যে অভিবাদন জানিয়ে নবাগতাকে বলল, "আসুন, সীমা দেবী। ভালোই হল, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।"

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বিস্মিত কণ্ঠে সীমা বলল, "আপনি দেখছি আমায় চেনেন। আমি কিন্তু আপনাকে কখনও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না।"

—"ঠিকই বলেছেন সীমা দেবী। আমাকে আপনি কখনও দেখেন নি।"

—"তাহলে আপনি আমায় চিনলেন কেমন করে ? কে আপনি ? মায়ের মতোই আপনিও অঞ্জনকেই কাজল বলছিলেন বোধহয়। উপরন্তু তার ঘোষ পদবীটাও বদলে চৌধুরি বানিয়ে দিয়েছেন ব্যাপারটা কি বলুন তো।"

"ব্যাপারটা বেশ জটিল," মেয়ের কথার উত্তর দিলেন শ্রীময়ী, "উনি, মানে মিঃ জোসেফ আমাদের শুভার্থী, আমাদের মঙ্গলের জন্যই উনি কাজলের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করছেন।"

"স্পর্ধারও একটা সীমা থাকা উচিত," সীমার মুখচোখ

লাল হয়ে উঠল, "মিঃ জোসেফ আপনার অযাচিত উপদেশের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমাদের পক্ষে আপনার মূল্যবান উপদেশ শিরোধার্য করা সম্ভব নয়।"

বলার সঙ্গে সঙ্গে মুখের উপর দরজা বন্ধ করতে চেয়েছিল সীমা। পারল না। জোসেফের একটা হাত দরজা চেপে ধরেছে, "আমি চলে যাচ্ছি। আমার কথাটা শুনলে ভালো করতেন। কাজল চৌধুরি মানুষটা ভালো কি মন্দ সেটা প্রশ্ন নয়। তার সাহচর্য আপনাদের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়, এই কথাটা মনে রাখবেন।"

দরজা ছেড়ে রাস্তায় নামল জোসেফ, তারপর দ্রুত পদক্ষেপে অন্তর্ধান করল···

দরজা বন্ধ করে উত্তেজিত স্বরে সীমা বলল, "মা, এই লোকটা কে বলো তো?"

"জানি না," শ্রীময়ী চিন্তিতভাবে বললেন, "লোকটা যে ভালো নয়, তা তো বুঝতেই পারছি। নাম শুনে মনে হয় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। তাও পুরো নামটা বলল না। কাজলের সঙ্গে ওর কী সম্পর্ক জানি না। তবে আমাদের সঙ্গে কাজল মেলামেশা করে, এটা ওর পছন্দ নয়। আমাদের তো একরকম শাসিয়েই গেল।"

"তাই তো দেখছি," সীমার মুখেও চিন্তার ছায়া, "পাড়ার ছেলেরা আমায় চেনে। কারও সঙ্গে আমাদের অসদ্ভাব নেই। চট করে এই বাড়িতে কেউ হামলা করতে পারবে বলে মনে হয় না। কিন্তু কাজলের অর্থাৎ অঞ্জনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক থাকলে এই লোকটার কী ক্ষতি? সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন অদ্ভুত আর জটিল মনে হচ্ছে।"

একটু থেমে সীমা আবার বলল, "এই জোসেফ লোকটিও অঞ্জনকে 'কাজল' বলে উল্লেখ করছিল। তুমিও ওকে 'কাজল' নামে ডাকছ। কারণ হিসাবে বলেছিলে অঞ্জন মানেই 'কাজল'—অর্থাৎ এটা ঠাট্টা। তা ঐ লোকটাও কি তোমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে ঠাট্টা করছিল?"

শ্রীময়ী মেয়ের কথার জবাব দিলেন না; নিরুত্তরে বাইরের ঘর ছেড়ে ভিতরের দিকে চলে গেলেন···

মালতীর মা দরকারী কথাটা বলার সুযোগ পাচ্ছিল না। 'সাহেব' আর মায়ের সাক্ষাৎকারের ফল যে খুব সন্তোষজনক হয় নি, সেটা সে বুঝেছিল। দিদিমণির আবির্ভাব এবং দুই পক্ষের কথোপকথন শুনে ব্যাপারটা বুঝতে না পারলেও পরিবেশের উত্তপ্ত আবহাওয়া সে অনুভব করতে পেরেছিল। শ্রীময়ীকে ভিতরের ঘরে এসে বসতে দেখে সে এগিয়ে এল। কিন্তু কপাল ঠুকে টাকার কথাটা বলার আগেই ঘরে ঢুকল সীমা। "ঐ লোকটা অঞ্জন ঘোষকে শুধু 'কাজল' বলে উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হয় নি, পদবীটাও বদলে দিয়ে বলছিল 'কাজল চৌধুরি'। এটা কেমন ব্যাপার হল মা? তুমিও তো প্রতিবাদ করলে না?"

"তুই আমার আগেই লোকটাকে অনধিকার-চর্চা করতে বারণ করেছিলাম," শ্রীময়ীর কণ্ঠস্বর শান্ত, "পদবী-টদবি বা নাম নিয়ে ওর সঙ্গে আলোচনা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।"

মালতীর মা প্রমাদ গুণল। সে বুঝতে পেরেছিল এখন টাকার কথা বলে লাভ হবে না। এমন সময়ে আবার দরজার কড়া নড়ে উঠতেই সে ছুটে গেল সেইদিকে। একটু পরে ফিরে এসে বলল, "মা, তোমায় একটি ছেলে ডাকতিছে।"

শ্রীময়ী আর সীমা পরস্পরের মুখের দিকে চাইলেন। সীমা বলে উঠল, "আজ দেখছি ঘন ঘন অতিথির আর্বিভাব ঘটছে।"

শ্রীময়ী হেসে বললেন, "আগের বারে 'সায়েব' এসেছিল। এবার 'বাবু' নয়, 'লোক' নয়—'ছেলে'! দেখে আসি ছেলেটা কেমন।"

"ছেলেটা খুব খারাপ," বলতে বলতে যে-ব্যক্তি ঘরের মধ্যে পা বাড়াল, তাকে দেখে চমকে উঠল মা আর মেয়ে।

"আপনি!" অস্ফুট উক্তি বেরিয়ে এল সীমার গলা থেকে।

"হ্যাঁ, আমি," অঞ্জন হাসল, "তোমরা বেশ চমকে গেছ দেখছি।"

"চমকাবে না?" শ্রীময়ীর হাসলেন, "বলা নেই, কওয়া নেই, বাইরের উটকো লোক অন্দরমহলে ঢুকে গেল! মেয়ে বোধহয় ক্ষেপে গেছে।"

ভ্রু কুঁচকে মায়ের দিকে তাকাল সীমা। না-বলে অন্দরমহলে অঞ্জনের পদক্ষেপ সে পছন্দ করে নি, কিন্তু মুখের উপর সেকথা শুনিয়ে দেওয়া তো দস্তুরমতো অপমানকর! এইভাবে অন্দরমহলে আসা যে অন্যায়, সে কথা অন্যভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার ভদ্র উপায়টাও কি শ্রীময়ীর মতো শিক্ষিত মহিলাকে বলে দিতে হবে? ····সীমা অবাক হয়ে দেখল মায়ের মুখে একটা হাসির রেখা উঁকি দিচ্ছে। অঞ্জনের মুখের দিকে তাকাল সে—নাঃ, সেখানেও তো অপমানিত মানুষের ক্রোধ বা বিরক্তির আভাস দেখা যাচ্ছে না! বরং তার ওষ্ঠাধরের উপর খেলা করছে একটা তরল হাসির রেখা!

"সীমাটা বেশ চটে গেছে, বুঝতে পারছি," হেসে হেসেই বলল অঞ্জন, "ওকে দোষ দেওয়া যায় না। বাইরের উটকো লোক না বলে কয়ে অন্দরমহলে এলে একজন ভদ্রমহিলার নিশ্চয়ই রাগ করার অধিকার আছে।"

"আছেই তো," শ্রীময়ী সহাস্যে বললেন, "তারপর ভদ্রমহিলাটি আবার দস্তুরমতো বিদুষী। নিজে উপার্জন করেন,
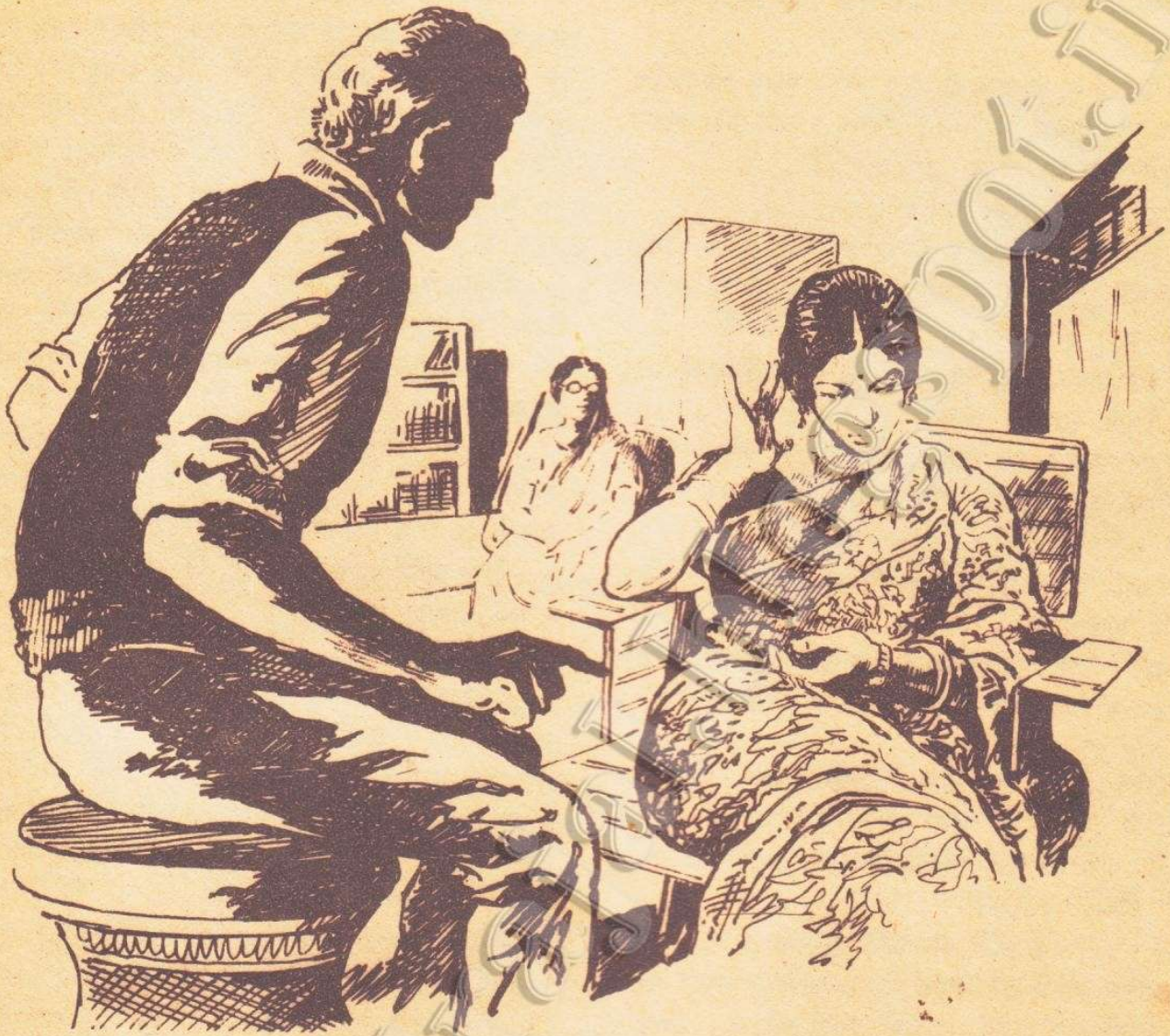
আবার মাকেও ভরণ-পোষণ করছেন।"

—"মা!"

মেয়ের ক্রুদ্ধ কণ্ঠ আর জ্বলন্ত দৃষ্টিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে শ্রীময়ী আবার বললেন, "যে-মহিলাটি সংসারের যাবতীয় দুর্বহ ভার স্কন্ধে বহন করছেন এবং যিনি দস্তুরমতো বিদুষী বলে পরিগণিত, তাঁর শয়নকক্ষে অনুমতি না নিয়ে প্রবেশ করা গর্হিত অপরাধ। অপরাধী শুধু এখানেই ক্ষান্ত হয় নি, উক্ত মহিলাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করার জন্য অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করে নি সে। এখন বলো কাজল, এই অপমানের প্রতিকার করা কি উচিত নয়?"

"অবশ্যই উচিত," অঞ্জন এখন দস্তুরমতো গম্ভীর, "প্রতিশোধ হিসাবে সীমার উচিত আমাকে 'তুমি' বলা। তাই নয় মা?"

"নিশ্চয়ই," সীমার দিকে তাকালেন না শ্রীময়ী, "তবে অঞ্জন না বলে 'দাদা' বলে সম্বোধন করলেই মেয়েকে আমি 'তুমি' বলার অধিকার দিতে পারি।"

—"সেকি! সীমা কি আমার নাম ধরে উল্লেখ করে নাকি? সামনে তো অঞ্জনবাবু বলে।"

—"আড়ালে সোজাসুজি অঞ্জন বলে। আমি অবশ্য নিষেধ করেছি। এসব অসভ্যতা আমার সহ্য হয় না। কী আর বলব কাজল—আজকালকার মেয়েগুলো যেমন অসভ্য, তেমনি উদ্ধত।"

"ঠিক কথা," অঞ্জন তৎক্ষমাৎ শ্রীময়ীর সঙ্গে একমত, "তবে হাল ছাড়লে চলবে না। অন্তত এই মেয়েটাকে মানুষ করতে হবে।"

"আমি তো পারলাম না," শ্রীময়ী হাসলেন, "এখন দ্যাখ্ তুই যদি পারিস।"

'তুই! সীমার ললাটে কয়েকটা রেখা পড়ল—নাঃ মা বড়

বেশি বাড়াবাড়ি করছে। এতটা গায়ে-পড়া ভাব ভালো লাগল না সীমার।

তার ভালো না লাগলে কী হবে, অপর দুজন পরমানন্দে আলাপ চালাতে লাগল, "আমিও কি পারব ? তবে চেষ্টা করতে হবে। একটাই যখন মেয়ে তোমার।"

—"আর তোর কেউ নয় ?"

—"হুঁ। আমার সঙ্গেও একটা সম্পর্ক আছে বৈ কি। কিন্তু তোমার বিদুষী কন্যা তো আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে চায় বলে মনে হচ্ছে না।"

—"ওর ইচ্ছায় কিছু আসে যায় না। যা-খুশি-তাই আর করতে দেওয়া হবে না ওকে।"

—"আপাততঃ চাকরিটা ওকে ছাড়তে হবে। নিজে উপার্জন করলেই মেয়েরা অতিরিক্ত স্বাধীনচেতা হয়ে পড়ে। তুমি কি বলো মা ?"

—"আমি আবার কী বলব ? তুই যদি ভালো মনে করিস, ও চাকরি ছাড়বে।"

অসহ্য ! সীমা প্রায় চেঁচিয়েই বলে উঠল, "চাকরি ছাড়লে আমরা খাব কী? আপনার ঐ বারোশো টাকা দিয়েই সারা জীবন চলবে নাকি ?"

"পাগল ! তা কখনও চলে !" অঞ্জন হাসল, "যা দরকার হয়, আমিই দেব। কি বলো মা ?"

"তুই যদি চালাতে পারিস, তাহলে ও চাকরি করবে কেন ?" শ্রীময়ী বললেন।

"মা ! এটা বড় বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না ?" সীমা ক্রোধ গোপন করার চেষ্টা করল না, "অঞ্জনবাবু আমায় গুণ্ডার খপ্পর থেকে বাঁচিয়েছেন, সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। মেয়েকে বাঁচিয়েছে মা হিসাবে তোমারও তাকে নিশ্চয়ই ভালো লাগতে পারে। কিন্তু তার টাকায় আমাদের খাওয়া-পরা চলবে একথা ভাবছ কী করে ? আমাদের কি মর্যাদাবোধ বলে কিছু নেই ? তোমার কাছে এমন অদ্ভুত ব্যবহার আমি আশা করি নি।"

শ্রীময়ী মুখ টিপে হাসলেন, "এতদিন আমার সঙ্গে রয়েছিস, আমাকে চিনলি না ? আমার মর্যাদাবোধ নেই একথা তুই ভাবতে পারলি সীমা ?

—"সেইটাই তো অদ্ভুত লাগছে। কিছু করবেন না অঞ্জনবাবু। আমি আবার"—

"অঞ্জনবাবু কেন ?" ধমকে উঠল অঞ্জন, "দাদা বলতে বুঝি মুখে আটকায় ?"

"হ্যাঁ, আটকায়", সীমা ক্রুদ্ধস্বরে বলল, "আমি দুদিনের পরিচয়ে 'দাদা', 'কাকা' এসব বলতে পারি না। এমন গায়ে-পড়া ভাবও আমি পছন্দ করি না।"

কথাটা বলেই থেমে গেল সীমা। তার ব্যবহার বড় বেশি রূঢ় হয়ে গেছে, এমন কি ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে বললেও ভুল হয় না। ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গীতে কিছু বলার জন্য অঞ্জনের মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল সীমা—কী আশ্চর্য ! অঞ্জন হাসছে ! লোকটার কি মান-অপমানবোধ নেই !

সত্যিই হাসছিল অঞ্জন, "তোমার মেয়েটা খুব অসভ্য হয়ে গেছে মা। ওকে শক্ত হাতে শাসন করা দরকার।"

শ্রীময়ীকে হাসতে দেখে আবার সীমার মাথা গরম হয়ে উঠল, "মা, আমাকে নিয়ে এভাবে কথা বললে আমি সহ্য করব না। অঞ্জনবাবুকে যদি এভাবে প্রশ্রয় দাও, তাহলে জোসেফ কী অপরাধ করল ?"

অঞ্জনের বিস্মিত চমক লক্ষ্য করল না সীমা, ক্রোধ উদ্‌গিরণ করল মায়ের দিকে তাকিয়ে, "জোসেফ কেন অঞ্জনবাবুর সঙ্গে তোমায় সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করেছে জানি না; কিন্তু আমি ব্যক্তিগত ভাবে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে রাজী নই ?"

—"সীমা !"

মায়ের কঠিন স্বরে সীমার চেতনা ফিরে এল। তার পক্ষেও দারুণ অভদ্রতা হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি নিজেকে সংশোধন করে সে বলে উঠল, "মানে, আমি কোন সম্পর্কের বাঁধনে আসতে চাই না একথাই বলেছি। অর্থাৎ দাদা-টাদা বলতে পারব না। একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে মহিলা হিসাবে একটা ভদ্র সম্পর্ক নিশ্চয়ই"—

সীমার বক্তব্য শেষ হল না, অসহিষ্ণুভাবে বাধা দিল অঞ্জন, "জোসেফ এখানে এসেছিল নাকি ? কেন এসেছিল ?"

অঞ্জনের উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে কী ছিল বলা যায় না, সীমার সর্বাঙ্গ দিয়ে ছুটে গেল আতঙ্কের শিহরণ !

সীমার কথার উত্তরে প্রশ্ন করলেও অঞ্জনের দৃষ্টি রয়েছে শ্রীময়ীর দিকে, "কেন এসেছিল জোসেফ ?"

শ্রীময়ী স্থিরদৃষ্টিতে তাকালেন অঞ্জনের দিকে, "তোমাদের সঙ্গে আমাদের সংস্রব রাখতে নিষেধ করেছে জোসেফ। সেইজন্যই এসেছিল সে। বলেছে"—

—"মা !"

সকলেই চমকে উঠল। দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে মালতীর মা, "আমি এবার যাব মা।"

"হ্যাঁ, অনেক রাত হয়ে গেছে," শ্রীময়ী ব্যস্ত হয়ে বললেন, "চলো, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসি।"

"মা," মালতীর মা এখন মরিয়া, কপাল ঠুকে বলে ফেলল, "দশটা টাকার খুব দরকার ছিল। আমার মালতী"—

বাধা দিয়ে শ্রীময়ী বললেন, "তোমার মেয়ে মালতীর

অসুখ তো ? সে তো বারোমাস লেগেই আছে। আমি এখন কিছু"—

"ঠিক আছে", অসহিষ্ণু স্বরে অঞ্জন বলে উঠল, "দশটা টাকা আমি দিয়ে দিচ্ছি। এই নাও।"

পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট মালতীর মায়ের দিকে বাড়িয়ে দিল সে।

মালতীর মা কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে শ্রীময়ীর দিকে তাকাতেই তাড়া দিয়ে উঠল অঞ্জন, "মায়ের দিকে তাকাতে হবে না। আমি দিচ্ছি। নিয়ে যাও। চলো, দরজাটা বন্ধ করতে হবে। হাঁ করে তাকিয়ে থেকো না, অনেক কাজ আছে আমার।"

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল দুজনেই। খিল তোলার আওয়াজ শোনা গেল। ফিরে এল অঞ্জন। সঙ্গে সঙ্গে রুষ্টকণ্ঠে বলে উঠল সীমা, "আমার এসব ব্যাপার ভালো লাগছে না। দশটা টাকা আমিও দিতে পারতাম। মালতীর মাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয় বলেই দিই নি। আপনি রাগ করবেন না অঞ্জনবাবু, শুধু মায়ের মত নিলেই চলবে না—এই সংসারে আমারও একটা মতামত আছে জানবেন।"

"জানি, ভদ্র সমাজের রীতিনীতি আমারও জানা আছে", অঞ্জনের কণ্ঠে পরিহাসের লেশমাত্র নেই, "দরকারী কথার মধ্যে তোমাদের ঝি বাধা সৃষ্টি করছিল, তাই ওকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে দিলাম। এতে রাগ করার কিছু নেই। তুমি না জানলেও তোমার মা জানেন আমার কাছ থেকে কিছু নিলে তোমাদের অমর্যদা হয় না। কারণটা জানলে তোমারও আমার কাছ থেকে কিছু নিতে বাধবে না।"

সীমা দৃঢ়স্বরে বলল, "সেই কারণটাই তাহলে আগে জানতে চাই।"

নিশ্চয়ই জানবে। তবে একটা কথা সর্বাগ্রে জেনে রাখা দরকার", অঞ্জনের কণ্ঠস্বর ভয়ানক গম্ভীর, "তোমাদের শিয়রে শমন এসে দাঁড়িয়েছে!"

"আকাশের বুকে জ্বলছে অসংখ্য তারা ... ওরা তারা নয়... অসংখ্য নক্ষত্রের অগ্নিময় চক্ষু মেলে মায়াবিনী রাত্রি তাকিয়ে আছে পৃথিবীর দিকে, পাহারা দিচ্ছে তার গোপন রহস্যের রত্নভাণ্ডার। পৃথিবীর মানুষ সেই রত্নভাণ্ডারের সন্ধান জানে না। কিন্তু আমি জানি। কারণ ?.. আমি যে রাত্রির সন্তান!"

আঁধার

ময়ূখ চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কাজল চৌধুরির কাহিনী

প্রথম স্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন শ্রীময়ী, "শিয়রে শমন বলছিস কেন ? জোসেফ লোকটা কি এতই ভয়ানক ? কে সে ? গুণ্ডা, না ডাকাত ?"

অঞ্জনের মুখে বিচিত্র হাসি ফুটল, "ডাকাত বা গুণ্ডা হলে ভয় পেতাম না। আমার ক্ষমতার সামান্য পরিচয় তোমার মেয়ে পেয়েছে। কিন্তু জোসেফকে আমিও ভয় পাই। কারণ, জোসেফ হচ্ছে এক ভয়ংকর জীব। সে যে কে এবং কী, তা আমিও ভালো করে জানি না।"

সীমা ভয় পেয়েছিল। শ্রীময়ী সহজে বিচলিত হন না, তিনি বললেন, "ব্যাপারটা ধাঁধার মতো লাগছে। জোসেফকে ভয় করার কারণ কী ? অন্ততঃ স্পষ্ট কবে সেকথাটা আমাদের বল্। তার সঙ্গে তোরই বা কী সম্পর্ক ?"

"সবই বলব", অঞ্জন চিন্তিত ভাবে বলল, "তবে এখন থেকে তোমাদের সব ভারই আমাকে নিতে হবে। জোসেফের

নির্দেশ মেনে চললে অবশ্য ভয় নেই। তোমাদের সঙ্গে যদি সম্পর্ক ছিন্ন করি, আমাদের মধ্যে যদি কোনদিন সাক্ষাৎকার না ঘটে, তাহলে ভয়ের কারণ থাকে না।"

সীমা বলল, "আপনি তো অনেক আগেই আমায় আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে নিষেধ করেছিলেন। আজ হঠাৎ আমাদের জন্য এমন ব্যস্ত হয়ে উঠলেন কেন?"

শ্রীময়ীর মুখের রেখাগুলো কঠিন হয়ে উঠল। তাঁর মনোভাব বুঝেই হাত তুলে তাঁকে নীরব থাকতে ইঙ্গিত করল অঞ্জন, তারপর দৃষ্টিপাত করল সীমার দিকে, "আমি ভুল করেছিলাম, সীমা। তোমাদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই সেদিন আমার সঙ্গে সংস্রব রাখতে নিষেধ করেছিলাম। আমার আশঙ্কা অবশ্য পরে সত্য হয়েছে। বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বুঝলাম কাপুরুষের মতো কর্তব্য ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাওয়া উচিত নয়। শুধু কর্তব্যের কথা বলব কেন? আমার মধ্যেই কি শূন্যতাবোধ ছিল না? মায়ের আদর আর স্নেহের স্পর্শ পাওয়ার জন্য আমার মনেও কি লোভ হয় নি? আমি জানতাম"—

বাধা দিয়ে শ্রীময়ী বললেন, "টাকাটা রেখে দিয়ে তুই যখন চোরের মতো পালিয়ে গেলি, তখনই মনে হয়েছিল তুই আর এখানে আসবি না। আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাইলে পরিচয় দিতে কোন বাধা তো ছিল না। তবে আমাদের জন্য যে তোর প্রাণ কেঁদেছে, টাকাটাই তার প্রমাণ। সেইজন্যই ঐ বারো শো টাকা নিয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ না করলে, কোন সম্পর্ক না রাখলে, ভবিষ্যতে তোর থেকে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করব না, এটাও আমি স্থির করেছিলাম।"

—"জানি মা। তোমাদের আমি চিনি না?··· চলে গিয়েছিলাম ঠিকই। কিন্তু মনটা তোমার কাছেই পড়েছিল। একটা অদ্ভুত লজ্জা আর অপরাধবোধের জন্য সেদিন পরিচয় দিতে পারি নি। বাবার মৃত্যুসংবাদও আমায় বিহ্বল করে দিয়েছিল। মনে হয়েছিল, আমি যদি সম্পর্ক রাখতাম তাহলে হয়তো এত তাড়াতাড়ি বাবার মৃত্যু হতো না আর তোমাদেরও এমন অভাব-অনটনের মধ্যে পড়তে হতো না। বিশ্বাস করো মা, তোমার জন্যই ভীষণ মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল, হয়তো পরে নিজে থেকেই তোমাদের কাছে ফিরে আসতাম—তুমি যে আমায় চিনেছ আর ক্ষমা করেছ, প্রকারান্তরে সেটা তুমি আমায় জানিয়ে দিয়েছিলে; কাজেই আসতে বাধা ছিল না—কিন্তু অন্য দিক থেকে বাধা এল ভয়ংকরভাবে। আজও সেই বাধা রয়েছে। তবু সব বিপদ আর ভয় তুচ্ছ করে আমি ফিরে এলাম মা, এখন থেকে তোমাদের সব দায়িত্বই আমার।"

"আমার কথাটা কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন অঞ্জনবাবু", সীমা বলে উঠল, "আপনার কাছ থেকে কোন আর্থিক সাহায্য আমি নিতে রাজী নই। শুধু মা নন, আমার কথাও আপনাকে ভাবতে হবে। আপনি বলেছিলেন আপনার কাছে কিছু গ্রহণ করলে আমাদের অসম্মান নেই! কারণটাও জানাবেন বলেছেন, কিন্তু এখনও জানাননি। সেই কারণটা না জানা পর্যন্ত আমার পক্ষে আপনার কাছ থেকে কোন আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করা সম্ভব নয়।"

হ্যাঁ, একথা তুমি বলতে পারো", অঞ্জন মাথা নিচু করে ক্ষণেক চিন্তা করল, তারপর পূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল সীমার দিকে, "আমি তোমার বড়ভাই। আমার কাছ থেকে সব কিছু নেবার অধিকার তোমার তো আছেই, এমন কি দাবিও আছে।"

"বড়ভাই! দাদা!" অস্ফুটস্বরে বলল সীমা। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বোধহয় এই অপ্রত্যাশিত সংবাদটা গ্রহণ করার চেষ্টা করল, তারপর বলে উঠল, "কিন্তু আমি তো কোনদিন আমার কোন ভাই-এর কথা মা-বাবার কাছে শুনি নি।"

"তারা কেন বলেন নি, তাঁরাই জানেন", অঞ্জন বলল, "বাবা নেই, এখন তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন মা। তবে তাঁদের নীরবতার কারণটা অনুমান করতে পারি। খুব সম্ভব ছেলের উপর অভিমানেই তাঁরা চুপ করে থেকেছেন, আমার অস্তিত্বের কথাটা পর্যন্ত তোমাকে জানানো দরকার মনে করেন নি।"

"তুমি ঠিকই বলেছ। আমি হয়তো হারিয়ে-যাওয়া দাদার

কথা সীমাকে বলতাম, কিন্তু ওর বাবা নিষেধ করেছিলেন। বলেছিলেন যে-ছেলে বাপকে এমন নিষ্ঠুরভাবে আঘাত দিয়ে চলে যেতে পারে, তার অস্তিত্ব আমি কোনদিন স্বীকার করব না," বলতে বলতে শ্রীময়ীর গলার স্বর ভারি হয়ে উঠল, "কাজল, পুরুষমানুষের চোখের জল বড় একটা দেখা যায় না, কিন্তু আমি ওঁকে গোপনে চোখের জল ফেলতেও দেখেছি। তাঁর কষ্ট লাঘব করার ক্ষমতা আমার ছিল না, তাই ওঁর চোখের জল দেখেও না-দেখার ভাণ করেছি। এই ব্যাপারে নিজেকেও কিছুটা দায়ী মনে করেছি। কাজটা তোর উচিত হয় নি কাজল।"

"হ্যাঁ মা, সেটা অনেক পরে বুঝেছি, সেই জন্যই তো প্রায়শ্চিত্ত করতে ফিরে এলাম" কাজল বলল, "কিন্তু মা তুমি নিজেকে দায়ী মনে করবে কেন? গৃহত্যাগের জন্য তোমাকে বা বাবাকে দায়ী করা যায় না, সব দোষই আমার। সুবুদ্ধি যখন হল, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে—বাবাকে আর দেখতে পেলাম না। কিন্তু মা, তুমি কি আমায় ক্ষমা করবে না?"

শ্রীময়ী উত্তর দিলেন না। তাঁর ক্লিষ্ট অধরে স্নিগ্ধ হাসির রেখাটি নীরবেই তাঁর মনোভাব প্রকাশ করে দিল।

সীমা এতক্ষণ চুপ করে ছিল, সামনে উপবিষ্ট যুবকটি তার বড় ভাই জেনেও আনন্দ বা উল্লাসের চিহ্ন তার মুখে দেখা দেয় নি। বোধহয় অপ্রত্যাশিত সংবাদের বিস্ময়কর চমকটা সে তখনও পরিপাক করে উঠতে পারে নি।

এবার নিজেকে সামলে নিয়ে সে মুখ খুলল, "বুঝলাম আপনি"—

বাধা দিয়ে কাজল বলল, "আপনি নয় সীমা—তুমি।"

সীমার মুখে কাষ্ঠহাসি ফুটল, "বেশ, না হয় তুমিই হল। অনেকদিন আগে, বোধহয় আমার জন্মেরও আগে আমার বড় ভাই বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছিল বুঝতে পারছি। কিন্তু রাতারাতি ছোট বোনের অধিকার জাহির করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে সংসারের দায়িত্ব যদি মা তাঁর বড়ছেলের কাঁধে চাপিয়ে দেন, আমি সেখানে আপত্তি করতে পারি না।"

কাজল বলল, "বেশ ভাববাচ্যে চালিয়ে গেলে দেখছি। মাকে আর বাবাকে ছেড়ে চলে যাওয়া আমার অন্যায় হয়েছিল সেকথা তো আমি স্বীকার করেছি। কিন্তু মা যখন আমায় ক্ষমা করেছেন, সেখানে ছোটবোন হয়ে তুমি দূরে সরে থাকবে কেন সীমা?"

সীমা মাথা নিচু করল, "সকলের চরিত্র সমান হয় না। সম্পর্কটা সত্য, কাজেই আমিও তা মেনে নিচ্ছি। কিন্তু এই মুহূর্ত থেকেই ছোটবোনের দাবি নিয়ে দাঁড়ানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

"জোর করে আর যাই হোক, ভালোবাসা আদায় করা যায় না", কাজল বুঝি একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল, "তবে তোমাকে আমার প্রথম দিন থেকেই খুব ভালো লেগেছিল। একটা আকর্ষণও বোধ করেছিলাম। হয়তো সেটাই রক্তের টান। যাই হোক আমায় কর্তব্য করতে যদি বাধা না দাও, তাহলেই আমি খুশি হব। এর বেশি চাওয়ার অধিকার বোধহয় আমার নেই।"

কাজলের কথার মধ্যে এমন একটা বেদনার্ত করুণ সুর ছিল যে, সীমার মনও বিচলিত হয়ে পড়ল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কাজলের দিকে তাকিয়ে তার মনোভাব অনুমান করার চেষ্টা করল সীমা। নতমুখ যুবকের মুখে ছায়া পড়ায় ভাবের কোন অভিব্যক্তি সীমার চোখে ধরা পড়ল না, কিন্তু বলার ভঙ্গীতে হতাশা ও বিষাদ ছিল অতিশয় স্পষ্ট।

একমুহূর্তেই সীমা মন স্থির করে নিল, এগিয়ে এসে কাজলের কাঁধে হাত রাখল সে, "দাদা, তুমি যে ঘর ছেড়ে পালিয়েছিলে সেটা বুঝতে পারছি। কেন গিয়েছিলে? এতদিন ছিলেই বা কোথায়? এই প্রশ্নগুলো আমার মনে ভিড় করেছে। সংক্ষেপে হলেও মোটামুটি সব কথা আমায় বলতে হবে। একটা কথা তো মানবে—মায়ের পক্ষে তোমায় গ্রহণ করা যত সহজ আমার পক্ষে সেটা তত সহজ নয়।"

কাজলের একটা হাত সীমার হাতের উপর এসে পড়ল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সরে গেল। মুহূর্তের জন্য হলেও সেই স্নেহের স্পর্শ বুঝতে সীমার ভুল হল না। একটু থেমে, বোধহয় অন্তরের আবেগ সংহত করে নিয়ে কাজল বলল, "আমার সব কথা শোনার অধিকার তোমাদের আছে। যদিও সময় বেশি নেই, তবু সংক্ষেপে সব কথা বলছি। এখন থেকে"—বাধা দিয়ে সীমা বলল, "সময় নেই বলছ কেন? এখানেই যা হোক কিছু মুখে দিয়ে শুয়ে পড়বে। কাল সকালে যা ভালো হয় কোরো।"

"না রে সীমা", কাজল হাসল, "কাল তো নয়ই, আর কোনদিনই সার্কাসে ফিরব না। তোদের আশ্রয়েই থেকে যাব। সার্কাসের মালিক হয়তো ঝঞ্ঝাট করতে চাইবে, তবে তাকে বোধহয় আমি অসুবিধার দিকটা বোঝাতে পারব। কিন্তু"—

—"সত্যি! সত্যিই তুমি আমাদের সঙ্গে থাকবে দাদা?

—"হ্যাঁ রে সত্যি। অবশ্য মা যদি আমায় তাড়িয়ে না দেন।"

শ্রীময়ী কপট ক্রোধে ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন, হ্যাঁ রে বেইমান ছেলে! মা-ই তো তোকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল বিশ বছর আগে।"

"বিশ বছর আগে!" সীমা সবিস্ময়ে বলল, "বিশ বছর আগে তুমি বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছিলে? কিন্তু কেন?"

"কেন আবার, মায়ের উপর রাগ করে," শ্রীময়ী বললেন, "আমি একটা গুরুতর অপরাধ করেছিলাম, তাই আমায় শাস্তি দিতেই গৃহত্যাগ করেছিলেন গুণধর ছেলে।"

"যাঃ ? কী যা-তা বলছ" সীমা মায়ের দিক থেকে চোখ সরিয়ে দাদার দিকে তাকাল, "বলো না দাদা, কেন পালিয়েছিলে বাড়ী থেকে ?"

গভীর পরিতাপে মাথা নিচু করল কাজল, "পরিহাস করে বললেও কথাটা সত্যি।"

—"সে কী ! কী অপরাধ করেছিলেন মা ?"

—"মায়ের কোন অপরাধ ছিল না। অপরাধ আমার।"

—হেঁয়ালি ভালো লাগে না। স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলো।"

—"স্পষ্ট করেই বলছি, শোনো। আমরা ভাই বোন, কিন্তু তুমি আমার সহোদরা নও।"

—"তার মানে ?"

"মানে বুঝলি না ?" শ্রীময়ী হাসলেন, "আমি ওর সৎমা, নিজের মা নই।"

—"বলো কী ?"

—"ঠিকই বলছি রে সীমা। তোর বাবার প্রথম স্ত্রী যখন মারা গেলেন, কাজলের বয়স তখন দশ। আরও পাঁচ বছর পরে তোর বাবা আমায় ঘরে নিয়ে আসেন। আমি সেই বিয়েতে আপত্তি করি নি। সেটা আমার প্রথম অপরাধ। দ্বিতীয় অপরাধ যে, সতীনের ছেলেটার উপর দারুণ অত্যাচার চালিয়েছিলাম, তাই"—

মা !" কাজল উঠে দাঁড়াল, "আমি জানি তুমি ঠাট্টার ছলে আমায় তিরস্কার করছ। কিন্তু তার দরকার আছে কি ? আমি কি আমার অপরাধ স্বীকার করি নি ? তোমার কথা সত্যি—বাবা দ্বিতীয়বার বিবাহ করায় আমি অসন্তুষ্ট হয়েছিলাম। আত্মীয়-স্বজন, বিশেষ করে আমার এক বিধবা পিসি, প্রতিমুহূর্তে আমার মনে বিষ ঢেলেছে। তখন না বুঝলেও পরে বুঝেছি, তুমি আসায় অনেকেরই স্বার্থ বিপন্ন হয়েছিল। একটা নিঃসঙ্গ মানুষের যন্ত্রণা বোঝার বয়স আমার তখনও হয় নি, কুচক্রী আত্মীয় স্বজনের কথায় বাবার উপর বিরক্ত হয়েছিলাম। পরে সেই বিরক্তি ক্রোধে পরিণত হয়েছিল। লজ্জার কথা কী বলব মা, তোমার সম্পর্কেও বিদ্বেষ পোষণ করতাম। অথচ তুমি আমার জন্য যথেষ্ট করেছ। নিজের ছেলের মতোই আমায় ভালোবেসেছিলে তুমি—পড়শুনা ফাঁকি দিয়ে আড্ডা দেওয়া, সিনেমা দেখা, সহ্য করে নি,—শাসন করেছ নিজের ছেলের মতোই, আর তোমায় ভুল বুঝে বাবার উপর রাগ করে আমি ঘর ছাড়লাম।"

তীব্র উত্তেজনায় ঘরের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে এসে হঠাৎ সীমার সামনে একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসে পড়ল কাজল, "শোন্ সীমা, আমাদের মায়ের মতো মা হয় না। নিজের ছেলেকে তো সব মা-ই ভালোবাসে, পরের ছেলেকে নিজের বলে আপন করে নিতে পারে কয়জন ? কিন্তু নতুন-মা ভস্মে ঘি ঢেলেছিলেন, তাঁর স্নেহের মর্যাদা আমি রাখতে পারি নি।"

চেষ্টা সত্ত্বেও অবরুদ্ধ আবেগ দমন করতে পারল না কাজল, উত্তেজিত স্বরে বলতে লাগল, "অল্প বয়সে মায়ের মৃত্যু দেখেছিলাম, কষ্টও পেয়েছিলাম খুব। পরে সেই কষ্ট ভুলে গিয়েছিলাম বাবার আদরে। তবে আমার দিকে বেশি মন দিতে পারেন নি বাবা। তার কাজকর্ম ছিল। সংসারের ভার পড়েছিল দূর সম্পর্কের এক বিধবা পিসির উপর। পিসি সংসার চালাত, বাবার টাকা পয়সা তার কাছেই থাকত। আমি চাইলে টাকা দিতে আপত্তি করত না পিসি। ছেলে যে আদর্শ ছাত্রের মতো জীবন যাপন করছে না সে-কথা বাবাও বুঝতেন না তা নয়, তবু মা-মরা ছেলেকে বোধহয় শাসন করতে পারতেন না। তার ফলে যা হয় তাই হল। কথায় বলে 'আদরে বাঁদর হয়।' আমিও একদিকে বাবার ঔদাসীন্য আর অপরদিকে পিসির অবাধ প্রশ্রয়ে একটি আস্ত বাঁদর হয়ে উঠছিলাম। নতুন-মা এসে সেই বাঁদরটাকে মানুষ করার চেষ্টায় উঠে পড়ে লাগলেন। আমার সেটা অসহ্য বোধ হতো। আড়ালে মায়ের সম্পর্কে পিসির বিরূপ সমালোচনাও মনের উপর ক্রিয়া করত।। ব্যাপারটা বোধহয় নতুন-মা বুঝতে পেরেছিলেন ; কিছুদিন পরেই পিসিকে বিদায় নিতে হল। চোখের জলে ভেসে পিসি আমায় জানিয়ে গেল যে, নতুন মায়ের জন্যই তাকে বাড়ী ছাড়তে হচ্ছে। তখন রাগ হলেও পরে বুঝেছিলাম আমার ভালোর জন্যই নতুন-মা পিসিকে চলে যেতে বাধ্য করেছিলেন। তবু একটা"—

বাধা দিয়ে শ্রীময়ী বললেন, "বহরমপুরে যেখানে তোর পিসি ছিল, সেখানে মাসে মাসে টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলাম। কিন্তু ঐ মহিলাটিকে এখানে রেখে তোমার পরকাল ঝরঝরে হতে দিতে পারি নি। ছেলের জন্য শক্ত হওয়ার দরকার ছিল।"

একটু থেমে শ্রীময়ী আবার বললেন, "বিয়ের পরেই উনি আমাকে বলেছিলেন ছেলেটা অমানুষ হয়ে যাচ্ছে, আমাকেই তাকে মানুষ করার ভার নিতে হবে। দ্বিতীয়বার বিবাহের সেটাই নাকি প্রধান কারণ। সেইজন্যই নির্বিকারভাবে তোকে ভাগ্যের হাতে সমর্পণ করতে পারি নি, প্রয়োজনে শাসন করার চেষ্টাও করেছি—ফল হল উল্টো।"

"শুধু কি শাসনই করেছ ?" কাজল শ্রীময়ীর দিকে তাকাল,

"আদরের কথাও আমার মনে আছে বৈকি। কত রাত্রে শোয়ার আগে গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করেছ, উপদেশ দিয়েছে, কত সময়ে নিজে পড়াতে বসেছ—সে-সব কথা কিছুই ভুলি নি, মা।"

একটু থেমে আবার ফেলে-আসা কথার সূত্র ধরল অঞ্জন, "হ্যাঁ, যা বলছিলাম, সীমা। মায়ের আদর মাঝে মাঝে ভালো লাগত, স্বীকার করতে লজ্জা নেই দুর্বল মুহূর্তে ভালো ভাবে চলার প্রতিশ্রুতিও দিতাম—তারপর আবার সব ভুলে যেতেও দেরি হতো না। আসলে দীর্ঘকাল খুশি-মতো চলার ফলে দস্তুর মতো স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছিলাম, নিয়ম-শৃঙ্খলার বাঁধন সহ্য করতে পারতাম না। একদিন লুকিয়ে সিনেমা দেখে মায়ের কাছে ধরা পড়ে গেলাম। এক বন্ধুর বাড়ীতে সন্ধ্যার পর অঙ্ক করতে যেতাম বন্ধুটি মেধাবী ছাত্র ছিল, অঙ্কে তার মাথা ছিল খুব পরিষ্কার। তাই বাবা কিংবা নতুন-মায়ের আপত্তি হয় নি। তাঁরা জানতেন আমি সন্ধ্যার পর ওখানেই নিয়মিত অঙ্ক করি। কিন্তু মাঝে মাঝে সেখানে না গিয়ে ঐ সময়টা যে আমি সিনেমা দেখে কাটিয়ে দিতাম, সেটা কারো জানা ছিল না। দৈবক্রমে একদিন নতুন-মা আমার জামার পকেট হাতড়ে আগের দিনের পরিত্যক্ত সিনেমার টিকিট আবিষ্কার করলেন। নিতান্তই বুদ্ধির দোষ—টিকিটটা ফেলে দেওয়ার কথা মাথায় আসে নি। কে জানত যে, ভদ্রমহিলা হঠাৎ আমার জামার পকেট 'সার্চ' করবেন! ধরা পড়তেই কৈফিয়ৎ তলব! আমি আজে-বাজে কথা বলে ব্যাপারটা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করতেই মুখের উপর একটা চড় পড়ল। বাবার কাছে কোনদিন মার খাই নি, চড়টা পড়তেই মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে উঠল। কোন কথা না বলে চুপ করে রইলাম, কিন্তু মনে মনে তখনই বাড়ী ছাড়ার সঙ্কল্প স্থির করে ফেলেছিলাম। পরের দিনই পালিয়ে গেলাম বাড়ী ছেড়ে।"

শ্রীময়ী হেসে বললেন, "বুঝে দ্যাখ্ সীমা, তোর মায়ের ক্ষমতা কতখানি। একটা পনের-ষোল বছরের ছেলেকে বাড়ী থেকে ছিটকে ফেলে দিলাম এক থাপ্পড়ে!"

সীমা হাসল না, মায়ের দিকে দৃক্‌পাত না করে কাজলকে বলল, "কোথায় পালালে? এতদিন কোথায় ছিলে? সব বলতে হবে।"

কাজল চুপ করে রইল। তার দৃষ্টি নিবদ্ধ পায়ের দিকে।

শ্রীময়ী বললেন, "আগের ব্যাপারটা জানা থাকলেও গৃহত্যাগের পরবর্তী অধ্যায়টা আমারও জানা নেই। বল্ না হতভাগা, বাড়ী ছেড়ে কোথায় গেলি?"

"কয়েকদিন আগে একটা সার্কাস দেখে এসেছিলাম। সার্কাসে বাঘের খেলা দারুণ ভালো লেগেছিল। আরও ভালো লেগেছিল সেই লোকটাকে, যে বাঘের খেলা দেখাচ্ছিল। তাকে গিয়ে ধরলাম, বললাম, সার্কাসে বাঘের খেলা শিখতে চাই। লোকটা তো প্রথমে হেসেই উড়িয়ে দিল। আমি না-ছোড়-বান্দা। বললাম, বাপ-মা নেই। পিসি আর পিসেমশাইয়ের-এর কাছে থাকি। তারা খেতে দেয় না, অত্যাচার করে"—

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে শ্রীময়ী বললেন, "এমন ডাহা মিথ্যে কথা বলতে আটকাল না?"

কাজল হেসে ফেলল, "কই আর আটকাল? তাছাড়া আত্মরক্ষার জন্য মিছে কথা বললে দোষ হয় না। যাই হোক, অনেকক্ষণ কাকুতি-মিনতি করার পর লোকটার মন গলল। বলল, যদি পুলিশের হাঙ্গামা হয় তাহলে কি হবে? জোর দিয়ে বললাম হাঙ্গামার সম্ভাবনা নেই, আমি চলে গেলে পিসি আর পিসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। লোকটা আমার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করে নি। বুক আর হাতের পেশী টিপে বলল, না-খেয়ে এমন চেহারা বাগানো যায় না। বললাম, একটা আখড়ায় বক্সিং লড়ি আর ব্যায়াম করি—আখড়ার শিক্ষক ভালোবাসে, তাই নিজের পয়সায় খাওয়ায়। কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। জানকীবাবু ছিলেন বক্সিং-এর গুরু, সত্যিই খুব ভালোবাসতেন আমাকে—তবে খাওয়ানোর কথাটা যে মিথ্যে, তা তো বুঝতেই পারছ। লোকটাকে শেষ পর্যন্ত জমিয়ে ফেললাম, তারপর আর বাড়ি ছাড়তে কতক্ষণ? সার্কাস পার্টির সঙ্গে প্রথমেই গেলাম মাদ্রাজে। যাওয়ার আগে অবশ্য বালিশের নিচে বাবাকে উদ্দেশ্য করে একটা চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিলাম"—

একটু থেমে শ্রীময়ীর দিকে তাকল কাজল, "চিঠিটা নিশ্চয়ই পেয়েছিলে তোমরা?"

শ্রীময়ী ঘাড় নাড়লেন। পেয়েছিলেন। তবে খোঁজখবর নেওয়া হয় নি। মহাদেবই বারণ করেছিলেন। যে-ছেলে এমনভাবে মা-বাপকে ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারে, তাকে ফিরিয়ে আনতে চান নি তিনি। শ্রীময়ীর আবেদন আর অনুনয়ও ব্যর্থ হয়েছিল তাঁর কাছে।

মায়ের কথা শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল কাজল। সীমা হঠাৎ অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠল, "তারপর কি হল? তুমি কি সেই সার্কাস পার্টির সঙ্গে এই বিশ বছর ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ঘুরে বেড়িয়েছ? এর আগে একবারও কলকাতায় আসো নি? একবারও মনে পড়ে নি আমাদের কথা?"

কাজল সস্নেহে বলল, "না, বোনটি, তোমার কথা মনে পড়ে নি। তোমার অস্তিত্বই তো জানতাম না তখন। তবে বাবা আর মায়ের কথা মনে পড়েছে বার বার। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে দেখা করব কেমন করে? আমি তো এখানে অর্থাৎ ভারতবর্ষে ছিলাম না।"—"তবে কোথায় ছিলে?"

—"ইউরোপ আর আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সার্কাস দলের সঙ্গে ঘুরেছি। একবার জাপানেও গিয়েছিলাম।"

—"জাপানেও গেছ? ঐ সার্কাস পার্টির সঙ্গে?"

—"না। তবে সব কথা খুলেই বলি। ইউরোপ ভ্রমণ সম্ভব হয়েছিল ভাগ্যের কৃপায়। মাদ্রাজে থাকতে আমার বুনো জানোয়ারের খেলা দেখে এক সাহেব মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। ঐ সাহেব ছিলেন আমেরিকার বাসিন্দা। তাঁর ভাইএর সার্কাসপার্টি ছিল। এখানে নয়, ইউরোপে। সেই সাহেবই চিঠিপত্র লিখে ভাই-এর ওখানে আমার একটা চাকরির বন্দোবস্ত করেছিলেন এবং আরও অনেক ঝঞ্ঝাট সামলে কেমন করে তিনি আমায় সাগরপারে পাঠিয়েছিলেন, পশ্চিম জার্মানিতে তখনকার এক ভ্রাম্যমান সার্কাস-দলে আমি কাজ পেয়ে গেলাম। তারপর ইউরোপ আর আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে ঘুরেছি, ঐ সার্কাস ছেড়ে অন্য সার্কাসে যোগ দিয়েছি। পর পর তিনবার বিভিন্ন সার্কাসে দল বদল করলাম। চতুর্থবার মোটা টাকার বিনিময়ে যোগ দিলাম আর একটি নতুন সার্কাস দলে। তাদের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে উপস্থিত হলাম ইতালিতে। সেখানে একটা ছোট শহরে এক সাংঘাতিক অভিজ্ঞতা হল।

সেদিন সন্ধ্যার পর বেড়াতে বেরিয়েছি। নতুন দেশ দেখার কৌতূহল ছিল। কয়েকদিন পরে খেলা শুরু হবে, এখন ছুটি—মনটাও ছিল বেশ খুশি-খুশি। হঠাৎ খেয়াল হল বেশ রাত হয়েছে, আশেপাশে দোকানগুলো অধিকাংশই, বন্ধ। যেগুলো খোলা আছে, সেগুলোতে বন্ধ করার তোড়-জোড় চলছে। ফিরে আসার জন্য পিছন ফিরলাম। সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে চারমূর্তি এসে আমায় ঘিরে দাঁড়াল। তাদের ভাষা না বুঝলেও ইঙ্গিতটা বুঝলাম; হাতের ঘড়ি আর পকেটের টাকা তাদের হাতে সমর্পণ না করলে পরিত্রাণ নেই। মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে উঠল। সামনের লোকটা চোয়ালে ঘুষি খেয়ে সটান শুয়ে পড়ল মাটির উপর।

এমন ব্যবহার বোধহয় আমার মতো লোকের কাছে গুণ্ডারা আশা করে নি। তারা বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে ওঠার আগেই আবার আঘাত করলাম—আরও একজন পেট চেপে ধরে বসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের দুই সঙ্গীর হাতে ঝক ঝক করে উঠল ধারাল ছুরি। আমি একটু পিছিয়ে প্রস্তুত হলাম আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য। সেদিন বোধহয় আমার মৃত্যুই হতো, কিন্তু রাখে হরি মারে কে? হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এল

আর একটি লোক। তারপরে ব্যাপারটা কি হল ঠিক বুঝতে পারলাম না, শুধু দেখলাম একটা লোক ঝাঁপিয়ে পড়ল গুণ্ডাদুটোর উপর এবং কয়েকমুহূর্তের মধ্যেই আমার দুই আততায়ী লম্বমান হল রাজপথে। আগন্তুক আমার হাত ধরে ছুট দিল। গলির পর গলির গোলকধাঁধার ভিতর দিয়ে অনেকদূর এসে আমরা যখন আবার বড় রাস্তার উপর এসে পড়লাম, তখন আমার রক্ষাকর্তা হাত ছেড়ে দিল। এতক্ষণে আমার রক্ষাকর্তার মুখের দিকে তাকানোর সুযোগ পেলাম। মঙ্গোলীয় চেহারা। ইংরাজিতে ধন্যবাদ জানালাম। আমার সৌভাগ্য, লোকটি ইংরেজি ভাষাটা জানত। কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিচয় জমে উঠল। লোকটি জাপানী, 'মার্শাল আর্টে' সুদক্ষ। প্রাচ্যদেশীয় পদ্ধতিতে ঐ লড়াইয়ের কথা আগে শুনেছিলাম, এইবার চাক্ষুষ দেখলাম। সেদিনের পরিচয় পরে বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল। আমাকে ঘেরাও হতে দেখেছিল সে, তাই ছুটে এসেছিল আমাকে বাঁচাতে। মার্শাল আর্টের কৌশল দেখে আমি চমকে গিয়েছিলাম। ঝোঁক চাপল যেমন করেই হোক প্রাচ্যদেশীয় পদ্ধতিতে লড়াইএর ঐ কৌশল আমায় আয়ত্ত করতেই হবে।

আমার রক্ষাকর্তা দেখেছিল আমি গুণ্ডাদের কাছে আত্মসমর্পণ করি নি, দস্তুরমতো লড়াই করেছিলাম। আমার সাহস আর ঘুষি চালানোর কায়দা তার ভালো লেগেছিল। তার কাছে প্রস্তাব করতেই সে আমায় মার্শাল আর্টের প্রাথমিক শিক্ষা দিতে রাজী হল। কিছুদিন তার কাছে ব্যাপারটা বুঝে নিলাম। অত্যন্ত কঠিন সাধনার ব্যাপার। কয়েকমাসে কিছু আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। আমার রক্ষাকর্তা বা শিক্ষক যা-ই বলো, ইতালীতে ব্যবসা করত। আমাকে যথেষ্ট সময় দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমাকে সার্কাসের খেলার জন্য যথেষ্ট সময় দিতে হতো। বুঝলাম, এভাবে কিছু হবে না। সার্কাসপার্টিতে ইস্তফা দিলাম। তারপর আমার শিক্ষক তোজোর পরামর্শ অনুসারে তারই চিঠি নিয়ে জাপানের একটা 'ক্যারাটেকা' অর্থাৎ ক্যারাটে শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করলাম। আমায় নানাভাবে পরীক্ষা করে ঐ ক্যারাটেকা আমায় উপযুক্ত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শিক্ষা দিতে সম্মত হলেন। একসময় বক্সিং শিখেছিলাম, সেটা এবার কাজে লাগল। কয়েক বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সাধনায় কিছুটা সিদ্ধিলাভ করলাম। এর মধ্যে অন্য ওস্তাদের কাছেও গেছি। ক্যারাটে, হুপকিডো, কুংফু প্রভৃতি মার্শাল আর্টের কৌশলগুলিকে যথাসাধ্য আয়ত্ত করলাম। এর মধ্যে টাকা ফুরিয়ে এসেছিল, সুতরাং আবার ফিরে গিয়ে ইউরোপের এক সার্কাস দলে যোগ দিতে বাধ্য হলাম। কয়েক বছরের ঐ ঘটনাবহুল জীবনেও বাবার কথা মনে হতো, আর"—

সীমা প্রশ্ন করল, "আর কী? থামলে কেন?"

—"আর নতুন-মায়ের কথাও মনে পড়ত বার বার। সত্যিকার ভালোবাসা বোধ হয় মানুষ ভুলতে পারে না। তাই নতুন-মাকেও বার বার মনে পড়ত। মাতৃস্নেহের মর্যাদা দিই নি বলে একটা অপরাধ বোধও মনকে পীড়া দিত। অবশেষে হঠাৎ সুযোগ হল ভারতে আসার। ভারতে এক সার্কাস-ব্যসায়ী তখন আমেরিকায় ছিল। দৈবক্রমে আমিও সেই সময় আমেরিকাতেই বিভিন্ন স্থানে খেলা দেখাচ্ছিলাম। ভদ্রলোক তো আমার খেলা দেখে মুগ্ধ; আমার সঙ্গে দেখা করে মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আমাকে তাঁর ভারতীয় সার্কাসে যোগ দিতে অনুরোধ করলেন। বালাই বাহুল্য, তৎক্ষণাৎ রাজী হলাম। যে-পার্টিতে সেই সময়ে কাজ করছিলাম, তাদের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ তখন ফুরিয়ে গিয়েছিল। তাই নতুন দলে যোগ দিতে বাধা ছিল না। কিন্তু একটা দুষ্কর্ম করে ফেললাম।"

"দুষ্কর্ম!" সীমা বিস্মিত হল, "সেটা কী রকম?"

শ্রীময়ীর কৌতুহল দৃষ্টিও সঞ্চালিত হল ছেলের মুখের উপর।

কাজল বলল, "আমি যেখানে কাজ করতাম, সেই সার্কাসপার্টি আমার অনুরোধে একটা ব্লাক জাগুয়ার কিনেছিল।"

সীমা বলল, "ব্লাক জাগুয়ার! সেটা কি বস্তু?"

শ্রীময়ী বলে উঠলেন, "দক্ষিণ আমেরিকার বনাঞ্চলে, বিশেষতঃ ব্রেজিলে জাগুয়ার নামে এক ধরনের বিড়াল জাতীয় জানোয়ার পাওয়া যায়। জাগুয়ারের চেহারা অনেকটা লেপর্ড বা চিতাবাঘের মতো। তবে চিতাবাঘের চাইতে জাগুয়ার বড় হয়, গায়ের জোরও তার বেশি। ভীষণ হিংস্র জন্তু। ওদের মধ্যে কোন কোনটা একেবারে কুচকুচে কালো। ইংরেজিতে তাদেরই ব্লাক জাগুয়ার বলা হয়।"

সপ্রশংস দৃষ্টিতে শ্রীময়ীর দিকে তাকাল কাজল, "সত্যি, এসব খবরও তুমি রাখো!"

মুখ টিপে হেসে শ্রীময়ী বললেন, "অবসর সময়ে একটু-আধটু বই পড়ার অভ্যাস ছিল। ঐসব বইএর দৌলতেই কিছু কিছু তথ্য জানতে পেরেছি।"

সীমা আবার ধৈর্য হারাল, "ব্লাক জাগুয়ার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আমি জানতে চাই না। জন্তুটাকে নিয়ে তুমি কোন্ দুষ্কর্ম করলে তাই বলো।"

কাজল বলল, "জাগুয়ার নিয়ে, বিশেষতঃ কালো জাগুয়ার নিয়ে খেলা দেখানো খুব কঠিন। কিন্তু কঠিন কাজ সম্পন্ন করতেই আমার বেশি ভালো লাগে। সার্কাসের মালিককে বলে কয়ে ঐ জানোয়াটা কেনার ব্যবস্থা করলাম, তারপর

বিমানযোগে সেই জ্যান্ত বিভীষিকাকে নিয়ে আমরা ফিরলাম ভারতবর্ষে।"

—"কিন্তু এরমধ্যে তোমার দুষ্কর্মের কোন সন্ধান তো পাচ্ছি না।"

—"সবটা শোন্। জন্তুটার নাম দিয়েছিলাম শয়তান। এমন সার্থকনামা জীব আমি দেখি নি। আফ্রিকার সিংহ থেকে শুরু করে সাইবেরিয়ার দুর্দান্ত বাঘ পর্যন্ত অনেক রকম হিংস্র জন্তু জানোয়ার নিয়ে খেলা দেখিয়েছি, কিন্তু শয়তান নামে এই ব্লাক জাগুয়ারকে কিছুতেই বাগ মানাতে পারলাম না। ওদিকে সার্কাসে খেলা শুরু হওয়ার দিন স্থির হয়ে গেছে, শহরে পোষ্টার পড়েছে—আমি ভেবেই পাচ্ছি না কী করব—সীমা, আমার অবস্থাটা বুঝতে পারছিস ?"

—"পারছি দাদা। তবে এবার তোমাকে যখন পেয়েছি, আর সার্কাসের তাঁবুতে তোমায় ফিরতে দেব না। এসব ভয়ানক জন্তুকে নিয়ে খেলা দেখালে যে কোন সময়ে বিপদ হতে পারে।"

—"তাতো পারেই। একবার একটা বাঘ আমার পাঁজরে থাবা বসিয়েছিল। সেই দাগও তোদের চোখে পড়েছিল। মনে পড়ে ? নখের আঁচড়ে তিনটি সমান্তরাল ক্ষতচিহ্নের সৃষ্টি হয়েছিল।"

—"তুমি কিন্তু মিছে কথা বলেছিলে। বলেছিলে একটা বনবেড়াল আঁচড়ে দিয়েছে।"

—"মোটেই মিছে কথা বলি নি। বাঘ হচ্ছে বিড়াল জাতীয় প্রাণী। ইংরেজিতে বাঘ-সিংহকে 'বিগ ক্যাট' বলে।"

—"চালাকি ! ঘুরিয়ে মিছে কথা বলেছ।"

—"উঁহু। তোদের কাছে আমি একবারও মিছে কথা বলি নি। নিজের নাম বলেছিলাম অঞ্জন ঘোষ। অঞ্জন মানে যে কাজল তা তো জানিস। ঐ নামটাই অবশ্য সর্বত্র চালু করেছিলাম, তোদেরও তাই বলেছি। তারপর পদবীটাও মিছে বলি নি। আমরা তো আসলে ঘোষ, উপাধি চৌধুরী। বাবা বলতেন 'ঘোষ চৌধুরি' শুনতে ভালো নয়, তাই তিনি ঘোষ উড়িয়ে দিয়ে শুধু চৌধুরী বলতেন। আমি চৌধুরি উড়িয়ে দিয়ে ঘোষকেই প্রাধান্য দিয়েছি। মিথ্যেটা কোথায় বললাম ?"

—"এখানেও চালাকি !... বেশ মানলাম এটাও পুরোপুরি মিথ্যে বলো নি। কিন্তু বাবার নামটা কি ঠিক বলেছিলে ?"

—"ঠিকই বলেছিলাম। ভেবে দ্যাখ্।"

—"বলেছিলে বিশ্বনাথ ঘোষ... ওঃ হো ? মহাদেবের আর এক নাম বিশ্বনাথ ! ঘোষ উপাধিও সত্যি, তবে ব্যবহার করা হয় না বলে খেয়াল করি নি। দাদা ! খুব ধোঁকা দিয়েছে আমাদের !"

"বহুবচন ব্যবহার করিস না সীমা," শ্রীময়ী হাসলে "আমি হতভাগাকে চিনতে পেরেছিলাম।"

"আর তখনই বুঝি অঞ্জন ঘোষের খোলস ছিঁড়ে কাজল চৌধুরিকে আবিষ্কার করলে ?" কাজল হেসে বলল, "আসলে হাতের জড়ুলটা হঠাৎ তোমার চোখে পড়ে গেল, তাই ধরা পড়লাম। না হলে আমায় চিনতে পারতে না।"

"না রে কাজল," শ্রীময়ী বললেন, "আগেই সন্দেহ হয়েছিল। বিশ বছরে অনেক বদলে গেছিস, কিন্তু আমার চোখে ধুলো দিতেপারিস নি। তবে জড়ুলটা দেখার পর যেটুকু সন্দেহ ছিল, সেটুকুও চলে গেল—নিশ্চিত বুঝলাম, গুণধর ছেলে বাপকে একবার দেখতে এসেছে।"

"শুধু বাপকে নয়," কাজল চোখ টিপে হাসল, "যে অত্যাচারী মহিলাটির থাপ্পড় খেয়ে বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছিলাম, তার জন্যও বড় মন কেমন করছিল।"

—"তাহলে চোরের মতো পালিয়ে গেলি কেন ?"

—"কেমন যেন সঙ্কোচ হল। হয়তো পরে আসতাম।"

"বাজে কথা," ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠল সীমা, "আমাকে তুমি সার্কাসের তাঁবুতে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলে। তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে নিষেধ করেছ। মাকেও তোমার কথা জানাতে নিষেধ করেছিলে। আজ তুমি আমাদের কাছে এসেছ বটে, কিন্তু সেদিন পর্যন্ত তুমি আমাদের এড়িয়ে চলারই চেষ্টা করেছ। আমার কথা অস্বীকার করার চেষ্টা কোরো না দাদা।"

—"অস্বীকার করছি না বোন, সত্যি কথাই বলছি। প্রথমে সঙ্কোচ হয়েছিল বলেই পরিচয় দিই নি। পরে নিশ্চয়ই আসতাম পরিচয়ও দিতাম। কিন্তু তারপরই বাধা এল।"

—"বাধা ! কীসের বাধা ?"

কাজলের মুখের হাসি হঠাৎ মিলিয়ে গেল, শুষ্কস্বরে সে বলল, "বাধা দিয়েছিল জোসেফ।"

"আমাদের সে চিনল কী করে ?" সীমা সবিস্ময়ে বলল, "মাকে সে কখনও দেখে নি। সার্কাসে সে আমায় দেখতে পারে, কিন্তু তার আগে আমার অস্তিত্ব তার জানার কথা নয়। অবশ্য তোমার মুখ থেকে আমাদের কথা সে জানতে পারে বটে।"

"আমি তাকে কোন কথাই বলি নি," ক্লান্তস্বরে কাজল বলল, "আমার বলাবলির অপেক্ষা রাখে না সে। আমি তাকে কিছু বলার আগেই আমার মা আর বোনের খবর সে আমাকেই জানিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, তাদের থেকে দূরে না থাকলে আমার অমঙ্গল হবে। মা-বোনের সংস্রব নাকি আমার পক্ষে ক্ষতিকর।"

"আবার একটা হেঁয়ালি !" সীমা রুষ্টকণ্ঠে বলল,

"আমাদের কথা সে কেমন করে জানল ? ঐ জোসেফ নামক ব্যক্তিটির সঙ্গে তোমার যোগাযোগই বা হল কী করে ? তোমার আত্মকাহিনী তো শুনলাম, এবার জোসেফের রহস্যটা একটু পরিষ্কার করো। একটা অজানা আতঙ্কের ভাব আমার ভালো লাগছে না, দাদা।"

"হ্যাঁ, জোসেফের ব্যাপারটা তো তোদের বলতেই হবে," কাজল বাঁ হাতের কবজি ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখল, "এখন খাওয়ার ঝামেলা সেরে ফেলা যাক। অনেক রাত হয়েছে। খাওয়ার পর জোসেফের কথা বলব। সতর্ক হওয়ার জন্য বিপদের সত্যিকার চেহারাটা তোদেরও জেনে রাখা দরকার।"

আগামী সংখ্যায় ● পরবর্তী পরিচ্ছেদ
দর্পণ ও আধার
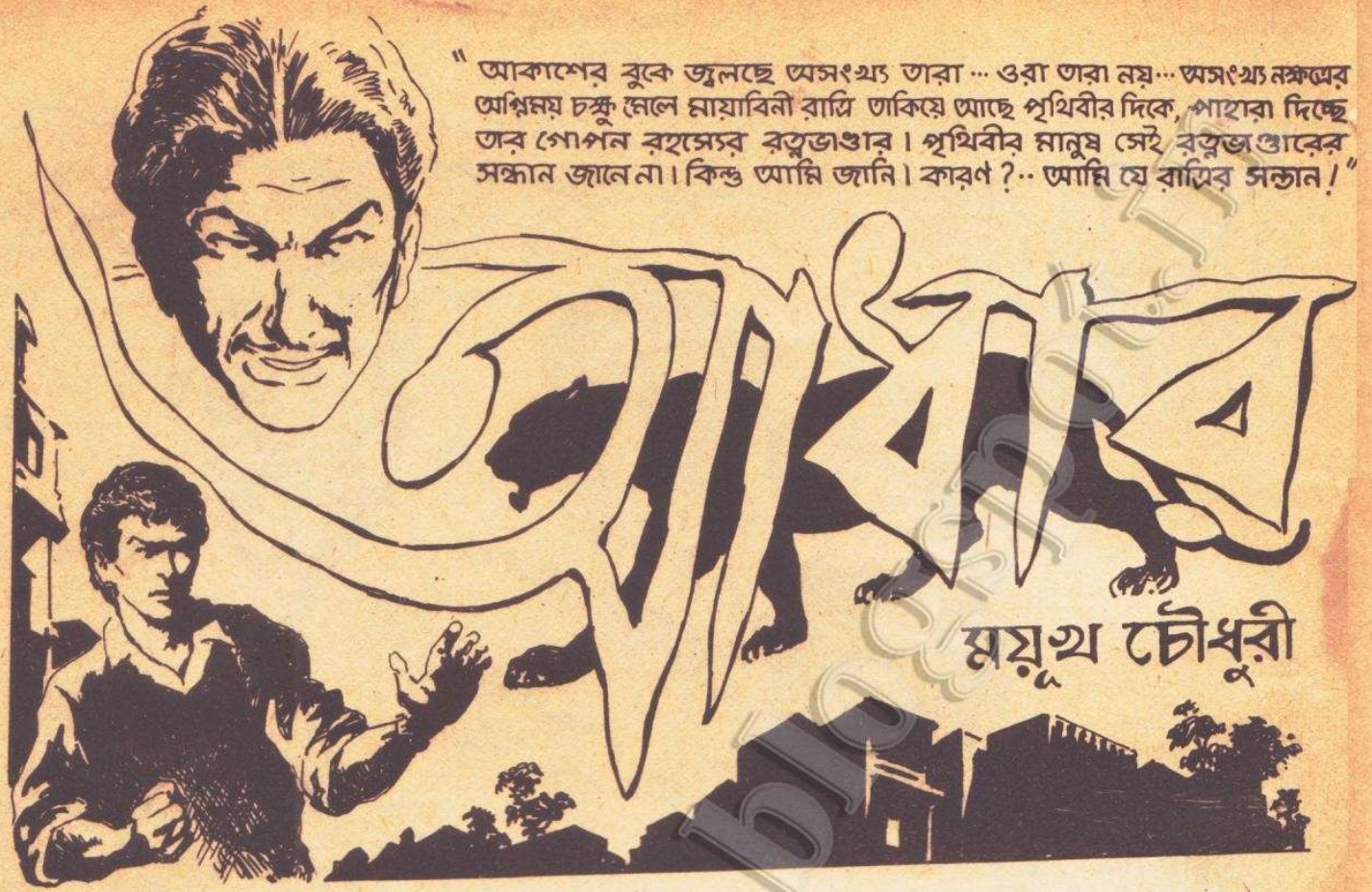
দর্পন ও আধার (পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রাত বারোটা। খাওয়া-দাওয়া শেষ। মা আর মেয়ের শয়নকক্ষেই মেঝের উপর কাজলের শয্যা প্রস্তুত হয়েছে। খাটের উপর মা ও মেয়ে, নিচে কাজলের বিছানা। কাজলের নির্দেশেই ঐ ব্যবস্থা। শ্রীময়ী ও সীমা বুঝেছিল কোন অজানা বিপদের আশঙ্কাতেই একঘরে রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করেছে কাজল। পারিবারিক পরিবেশ এর মধ্যেই যথেষ্ট সহজ হয়ে উঠেছে। নিজের অজ্ঞাতসারেই সীমাকে 'তুমি' ছেড়ে 'তুই' বলেছে কাজল এবং সীমার ব্যবহারেও ছোটবোনের অধিকার-বোধ এখন অতিশয় স্পষ্ট। সম্ভবতঃ অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কাই অল্পসময়ের মধ্যে দূরের মানুষদের কাছে টেনে এনেছে।

কোন ভূমিকা না করেই কাজল বলল, "অনেক রাত হয়েছে, শুয়ে পড়াই উচিত ছিল। তবু এখনই শুয়ে পড়া চলবে না। জোসেফের বৃত্তান্ত আজ রাত্রেই তোমাদের জানানো দরকার। শিয়রে শমন নিয়ে নিশ্চিন্তভাবে ঘুমানো উচিত হবে না।"

"আমরা তো শুনতেই চাই," সীমা বলল, "তুমি যখন বাড়ীতে জায়গা থাকা সত্ত্বেও আমাদের সঙ্গে এই ঘরে তোমার শোয়ার ব্যবস্থা করতে বললে, তখনই বুঝলাম আজ রাত্রে কোন বিপদের আশঙ্কা করছ তুমি। দাদা, তুমি বাড়ী আছ এটা মস্ত ভরসা। তবু বিপদের সঠিক চেহারাটা না জানা পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছি না। মোটামুটি একটা কথা অবশ্য বুঝতে পারছি ;—অজানা বিপদের সঙ্গে জড়িত রয়েছে জোসেফ নামে রহস্যময় মানুষটি।"

—"নির্ভুল অনুমান।"

—"দাদা, আজকের রাত হয়তো নিরাপদেই কাটবে। কারণ, তুমি রয়েছ। কিন্তু এভাবে অজানা আশঙ্কার মধ্যে দিনের পর দিন কাটাব কি করে? প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে আমাদের পাহারা দেওয়া তোমার পক্ষে ও সম্ভব নয়। তাছাড়া আমার স্কুল আছে, সন্ধ্যার পর মেয়ে পড়ানোর কাজগুলো রয়েছে, আমাকে তো দিনে-রাতে বাইরে বেরোতেই হবে। বিপদের হামলা আমার উপর যখন-তখন হতে পারে।"

—"স্কুল আর মেয়ে-পড়ানোর ব্যাপারটা এখন ভুলে যা সীমা। তবে তোর কথাটা সত্যি—প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে তোদের চোখে চোখে রাখা সম্ভব নয়, তার প্রয়োজনও নেই। আজকের রাত ভালোয় ভালোয় কেটে গেলে ভয়ের কারণ আর থাকবে না।"

—"সেকী! জোসেফ কি তোমায় বলেছে যা-কিছু করার আজ রাতেই করবে! আজ যদি সে ব্যর্থ হয়, তাহলে ভবিষ্যতে

কখনও আমাদের উপর সে হামলা করবে না এমন কথা অবিশ্বাস্য। দাদা, তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না।"

—"বুঝিয়ে দিচ্ছি। আজ রাতে যদি কোন অঘটন না ঘটে, তাহলে ভবিষ্যতে কোনদিনই জোসেফ আমাদের নাগাল পাবে না। কাল সন্ধ্যার আগেই আমাদের ভারত-ভ্রমণ শুরু হবে। জোসেফের পক্ষেও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে হানা দিয়ে আমাদের আবিষ্কার করা সম্ভব নয়।"

—"ভারত-ভ্রমণ! সে যে অনেক টাকার ধাক্কা! তাছাড়া আমার স্কুল?"

—"আবার বাজে কথা? স্কুল-টুল ছেড়ে দিবি। আর টাকার ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না। জীবনটাকে বাজী রেখে বিশ বছর ধরে লড়াই করেছি ভাগ্যের সঙ্গে, একসময়ে ভাগ্যলক্ষী আমায় কৃপা করেছেন—অতএব টাকার ভাবনা এখন নেই। ভারতের বাইরেও কয়েকটা ব্যাঙ্কে আমার টাকা আছে। সেই টাকার পরিমাণও খুব কম নয়। তবে মনে হয় সেখানে হাত দেওয়ার দরকার হবে না।"

"আমারও তাই মনে হয়," এতক্ষণ বাদে কথা বললেন শ্রীময়ী, উনি আমার নামে ত্রিশ হাজার টাকা রেখে গিয়েছিলেন; বলেছিলেন বিশ বছরের মধ্যে যদি ছেলে ফিরে আসে, তাহলে ঐ টাকা যেন তাকেই দেওয়া হয়। বিশ বছর পেরিয়ে গেলে টাকাটা মেয়েরই প্রাপ্য হবে। সীমার কুড়ি বছর পূর্ণ হওয়ার দিন সাতেক আগে এই বাড়িতে তুই এসে পড়েছিলি তোর বোনের সঙ্গে। কাজেই ঐ টাকাটা এখন তোর প্রাপ্য। কীভাবে সেটা তুই খরচ করবি সেটা আমাদের জানার দরকার নেই।"

সীমা হাঁ করে মায়ের কথা শুনছিল, এবার বলে উঠল, "ঈস্! দাদা যদি এলই, তবে সাতদিন পরে আমার জন্মদিনটা পার করে এল না কেন? এতগুলো টাকা হাত ফসকে চলে গেল।"

"দুঃখ করিস না বোন," কাজল হাসল, "ঐ টাকা তোরই থাকবে। ওখানে হাত দেওয়ার দরকার হবে না।"

"আমি ঠাট্টা করছিলাম দাদা," সীমা গম্ভীর হয়ে গেল, "তুমি স্বচ্ছন্দে ঐ টাকাটা নিতে পারো। তুমি যখন আমাদের ভার নিচ্ছ, তখন আলাদা করে আমার টাকার দরকার হবে কেন?"

কাজল কিছু বলার আগেই শ্রীময়ী বললেন, "তর্কের দরকার নেই। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে আর্থিক সমস্যাটা আমাদের সমস্যা নয়, কিন্তু আসল সমস্যা সম্পর্কে আমরা যে-অন্ধকারে ছিলাম, এখনও সেই অন্ধকারেই আছি। কাজল, সময় নষ্ট না করে জোসেফ সম্পর্কে যা জানিস, আমাদের বল্। তোর মতো ছেলেও যাকে ভয় পায়, সে নিশ্চয়ই ভয়ংকর মানুষ।"

"শুধু ভয়ংকর নয়," কাজল বলল, "ভয়ংকর বললে তাকে কিছুই বলা হয় না! জোসেফ হচ্ছে এক অমানুষিক মানুষ, যার সঙ্গে লড়াই করা অসম্ভব। আইন তাকে ছুঁতে পারবে না। দৈহিক শক্তি দিয়ে তার মোকাবিলা করতে হলে পৃথিবীর সব চাইতে শক্তিমান মানুষও পরাজিত হবে।"

ভীত কণ্ঠে সীমা বলল, "তোমার মতো দুধর্ষ মানুষও যদি তাকে ভয় পায়, তাহলে আমরা তার কবল থেকে আত্মরক্ষা করব কেমন করে?"

"আমরা পালিয়ে যাব। জোসেফ আমাদের সন্ধান পাবে না। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ঘুরে ঘুরে কয়েকটা মাস আমরা কাটিয়ে দেব। এই সময়টা পার হয়ে গেলেই আমরা নিরাপদ। কারণ, এটা প্রতিশোধের ব্যাপার নয়—শুধুমাত্র আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কাতেই লোকটা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। সামনে থেকে আমরা সরে গেলে সে আরও বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে বটে, কিন্তু সেই ক্রোধ নিতান্তই সাময়িক। জোসেফকে যতদূর জানি, বিনা প্রয়োজনে অনর্থক প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি তৃপ্ত করার জন্য সে আমাদের সন্ধানে সময় নষ্ট করবে না। আধার ভাঙ্গলে সে অন্য আধারের সন্ধানে মনোনিবেশ করবে।"

—"আধার!...মানে পাত্র?"

—"হ্যাঁ।"

—"দাদা! আবার হেঁয়ালি? আমি কিন্তু রেগে যাচ্ছি।"

"না, না, রাগ করিস না," কাজল ব্যস্ত হয়ে উঠল, "আসলে জোসেফ লোকটাই এক মূর্তিমান রহস্য, তার সম্বন্ধে সব কিছু খুলে না বলে মাঝখান থেকে কিছু বললে হেঁয়ালির মতোই মনে হবে। আচ্ছা, এবার মন দিয়ে শোন্, তুমিও শোনো মা—

কয়েকমাস আগের কথা। সীমার সঙ্গে যে-রাতে নাটীয়ভাবে আমার পরিচয় ঘটল, সেই রাতেই আমি জোসেফের সঙ্গেও পরিচিত হলাম একটা রেস্তরার মধ্যে। লোকটা নিজে থেকেই এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করেছিল। কিছুক্ষণ আজে-বাজে কথা বলে সে শয়তানের উল্লেখ করল"—

শ্রীময়ী ও সীমা দুজনেই চমকে গেলেন, "শয়তান! তার মানে?"

—"ব্রেজিল থেকে যে কালো জাগুয়ারটাকে আমদানী করা হয়েছিল, তার নাম দিয়েছিলাম শয়তান। কথাটা একটু আগেই বলেছি, তোমরা ভুলে গেছ। এখন যা বলছি, মন দিয়ে শোনো। শয়তান নামকরণ সার্থক হয়েছিল। এমন বেয়াড়া জানোয়ার নিয়ে আগে কখনও খেলা দেখাই নি। অনেক চেষ্টা

করেও জন্তুটাকে যখন বাগ মানাতে পারলাম না"—

বাধা দিয়ে সীমা বলল, "বাঃ! আমি তো সার্কাসে ঐ কালো জাগুয়ারের খেলা দেখেছি। জন্তুটা তোমার কথায় পোষা কুকুরের মতো খেলা দেখিয়েছে, প্রতিটি আদেশ পালন করেছে নির্বিবাদে।"

—"আহা! আমার বক্তব্য তো এখনও শেষ হয় নি। তুই বড় অসহিষ্ণু সীমা। ধৈর্য বলে কোন পদার্থ তোর মধ্যে নেই।"

—"ঠিক আছে। আমি আর একটাও কথা বলব না। কিন্তু জাগুয়ার নিয়ে আমি গবেষণা শুনতে চাই না। আমি জোসেফের কথা শুনতে চাই।"

—"জাগুয়ারের প্রসঙ্গ অকারণে তুলি নি। মাঝখানে বাধা দিলে কথার খেই হারিয়ে যায়। কি যেন বলছিলাম···হ্যাঁ, যে-রাতে তোর সঙ্গে পরিচয় হল, সেই রাতেই আমি তোদের বাড়ীতেই আসছিলাম। ইচ্ছে ছিল, বাবার সঙ্গে দেখা করব। বাবার সঙ্গে দেখা হল না, তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে খুবই বিচলিত হয়েছিলাম। অবশ্য তোদের সামনে আমার মনোভাব প্রকাশ করি নি। মা যে আমায় চিনতে পেরেছিলেন, সেটাও বুঝেছিলাম। মা-ই সেটা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। কায়দা করে কিছু টাকা ফেলে এলাম, কিন্তু মনটা তোদের জন্য ভীষণ ছটফট করতে লাগল। ক্ষুধাবোধ একেবারেই ছিল না, কিন্তু তৃষ্ণা পেয়েছিল ভীষণ। ঠাণ্ডা কিছু গলায় ঢালার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। সেই সঙ্গে একজায়গায় একা একা বসে মনটাকে শান্ত করারও প্রয়োজন বোধ করছিলাম। অত রাতে কলকাতার দক্ষিণ অঞ্চলে কোন ভালো রেস্তঁরা খোলা থাকে না, তাই চৌরঙ্গী এলাকায় এসে একটা রেস্তঁরায় ঢুকে ঠাণ্ডা পানীয় চাইলাম। সেখানেই জোসেফের সঙ্গে আলাপ। সোজাসুজি কোন কথা না বলে ইঙ্গিতে জোসেফ বুঝিয়ে দিল আমার সমস্যা সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ অবহিত—অর্থাৎ ব্রেজিল থেকে আমদানী করা বিপদ নিয়ে যে আমি অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় পড়েছি, সে-কথা তার অজানা নয়। অবাক হয়ে গেলাম। দুদিন পরে খেলা, এখনও জন্তুটাকে বাগ মানাতে পারি নি—তাই নিয়ে আমার দুশ্চিন্তার কথা বাইরের লোক জানবে কী করে?····শুধু এখানেই শেষ নয়, আমার আসল নামটা তার মুখে শুনে চমকে উঠেছিলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম ইউরোপ বা আমেরিকার কোন দেশে হয়তো সে আমার খেলা দেখেছে, এখানে এসে আমায় চিনতে পেরেছে। একটু ভাবতেই ভুল ভাঙল। বিদেশে আমি খেলা দেখিয়েছি 'অঞ্জন ঘোষ' নামে, 'কাজল চৌধুরি' নামটা তো কারও জানা সম্ভব নয়! শয়তানকে নিয়ে আমার সমস্যার কথাই বা সে জানল কী করে?····সমস্যার সমাধান করে দিল জোসেফ স্বয়ং। বলল, 'আপনার বিপদের স্বরূপ আপনি জানেন না, চিনে নিন।' বলেই তার বাঁ হাতের অনামিকাতে বসানো একটা আংটি আমার চোখের সামনে তুলে ধরল। আশ্চর্য ব্যাপার—আংটির চৌকো কালো পাথরটা স্বচ্ছ হয়ে গেল, ফুটে উঠল একটি পরিচিত প্রতিমূর্তি! সেই প্রতিমূর্তির দিকে তাকিয়ে জোসেফ

বলল, 'মিঃ চৌধুরি, আপনার বিপদের সত্যিকার চেহারাটা দেখে নিন।' সীমা ভাবতে পারিস আংটির দর্পণে কার চেহারা ফুটে উঠেছিল ?"

রুদ্ধশ্বাসে সীমা বলল, "শয়তান ! মানে, ঐ কালো জাগুয়ারের চেহারাই নিশ্চয় ভেসে উঠেছিল ?"

—"না। আংটির দর্পণে দেখলাম মাকে !"

—"মা !"

—"হ্যাঁ, মাকেই দেখেছিলাম কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপর মায়ের চেহারা মুছে গেল, ফুটে উঠল তোর ছবি।"

—"সীমার ছবি ফুটে উঠল আংটির মধ্যে ! প্রথমে আমি, তারপর সীমা ! এ যে অবিশ্বাস্য !"

—"হ্যাঁ মা। অথচ তোমাদের সে আগে কখনও দেখেনি।"

অপরিসীম বিস্ময় আর আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে রইল দুই নারী।

"শুধু এখানেই শেষ নয়," কাজল বলতে লাগল, "আরও আছে। খুব স্পষ্ট করে কিছু না বললেও আভাসে-ইঙ্গিতে জোসেফ যা বলল, তা থেকে বুঝলাম অদ্ভুত অলৌকিক শক্তির অধিকারী সে। তার আরও ক্ষমতার পরিচয় পেলাম একটু পরে। রেস্তঁরার মধ্যে একটি বিদেশীর সঙ্গে মালিকের বাদানুবাদ শুরু হয়, তারপর ঐ বিদেশী মানুষটির সঙ্গে রেস্তঁরার বেয়ারাদের মারামারি লেগে যায়। একটা লোকের বিরুদ্ধে অতগুলো বেয়ারাকে লাগতে দেখে আমার রক্ত গরম হয়ে উঠল, কিন্তু জোসেফ ব্যাপারটায় নাক গলাতে দিল না—সোজা এগিয়ে গেল ঝটাপটি আর মারামারির মধ্যে। জোসেফের হাতের এক ঝটকায় একটা বেয়ারা ছিটকে পড়ল। বুঝলাম হাতাহাতির ব্যাপারেও এই আশ্চর্য মানুষটির ভালো অভিজ্ঞতাই আছে। আহত বেয়ারার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে সে মালিকের বুঝিয়ে দিল পুলিস এলে তারই বদনাম, আর বিদেশীর স্বপক্ষে ও মালিকের বিপক্ষে সাক্ষী দেবে সে নিজে এবং তার সঙ্গী—অর্থাৎ আমি—অতএব এই মুহূর্তে মালিক যেন তার বেতনভোগী বেয়ারাদের সংযত করে, না হলে সমূহ বিপদ।

মারামারি বন্ধ করার জন্য মালিকের আদেশের প্রয়োজন ছিল না, বিদেশী মানুষটা দস্তুরমতো শক্তিমান, তাকে নিয়েই বেয়ারার দল নাস্তানাবুদ হচ্ছিল—এখন জোসেফকে বিরোধীপক্ষে যোগ দিতে দেখে তারা ঘাবড়ে গেল। বিদেশীর সঙ্গে অজানা ভাষায় কথাবার্তা চালিয়ে কলহের কারণটাও আবিষ্কার করল জোসেফ। বিদেশী যে-খাদ্যের 'অর্ডার' দিয়েছিল, তা না দিয়ে অন্য খাবার এনেছিল বেয়ারা। লোকটি সেই খাবার খায় নি এবং না-খাওয়া খাবারের জন্য দাম দিতেও রাজী হয় নি। ব্যাপারটা ইংরেজিতে মালিককে বুঝিয়ে দিল জোসেফ। মালিক তৎক্ষণাৎ দুঃখপ্রকাশ করে বিদেশীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল। আসলে পরস্পরের ভাষা বুঝতে না পারার জন্য এই বিভ্রাট।

গোলমাল মিটলে জোসেফকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম লোকটি পর্তুগীজ। পর্তুগীজ ভাষায় জোসেফের এমন অদ্ভুত দখল দেখে বিস্ময় প্রকাশ করতেই সে জানাল পৃথিবীর সতেরোটি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে সে ! শুনে আমি হতবাক !

রেস্তঁরা থেকে সার্কাসের আস্তানায় ফেরার সুযোগ আমি পেলাম না। জোসেফ আমায় জোর করে নিয়ে গেল পার্ক স্ট্রীটের এক অভিজাত হোটেলে, সেখানেই নাকি সাময়িকভাবে বাস করছে সে। হোটেলটা প্রথম শ্রেণীর না হলেও বেশ ব্যয়বহুল, বুঝলাম জোসেফের আর্থিক অবস্থা দস্তুর মতো ভালো। সেখানে বসেই তার অনুরোধে নৈশভোজন সমাপ্ত করতে বাধ্য হলাম। তার পরই নতুন বিস্ময়ের চমক। আমার সবচেয়ে বড় বিপদ যে মা আর বোনের সান্নিধ্য থেকেই আসতে পারে সেকথা তো জোসেফ আমায় আগেই বলেছিল, এবার আমার সবচেয়ে কল্যাণকর বস্তুটির স্বরূপ সে আমায় দেখিয়ে দিল। আমার চোখের সামনে তার বাঁ হাতের প্রসারিত অনামিকায় বসানো রহস্যময় আংটির দর্পণে ফুটল—

"নাঃ, আমি বলব না, তোমরা অনুমান করতে পারো কার ছবি দেখলাম সেই আংটির দর্পণে ?"

সমবেত নারীকণ্ঠে উত্তর এল, "জোসেফ !"

কাজল মাথা নাড়ল। উত্তর ঠিক হয় নি। হতবুদ্ধি মা আর বোনের দিকে তাকিয়ে হাসল কাজল, "দর্পণে ফুটল কুচকুচে শয়তান, অর্থাৎ সার্কাসের কালো জাগুয়ারটাকে দেখলাম আংটির আয়নার মধ্যে !"

দুজনেই চুপ। শ্রীময়ী বা সীমা কারও মুখেই কথা নেই।

কাজল আবার বলল, "ঐ শয়তানই নাকি আমার সৌভাগ্যের জীবন্ত প্রতীক ! জোসেফ কথাটা একেবারে ভুল বলে নি। এক অমানুষিক মানুষের কাছে যদি আত্মবিক্রয় করি, তাহলে ঐ জন্তুটা আমায় এনে দিতে পারে প্রচুর অর্থ !"

হতভম্ব সীমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল, "বলো কী দাদা !"

"আমি কিছুই বলি না," কাজল হাসল, "জোসেফ বলছে ঐ ভয়ংকর জন্তুটাই আমার সৌভাগ্যের আধার। এমন উপযুক্ত আধার নাকি হয় না !"

[ক্রমশঃ]

আগামী সংখ্যায় অথ সারমেয় ঘটিত

"আকাশের বুকে জ্বলছে অসংখ্য তারা ... ওরা তারা নয়... অসংখ্য নক্ষত্রের অগ্নিময় চক্ষু মেলে মায়াবিনী রাত্রি তাকিয়ে আছে পৃথিবীর দিকে, পাহারা দিচ্ছে তার গোপন রহস্যের রত্নভাণ্ডার। পৃথিবীর মানুষ সেই রত্নভাণ্ডারের সন্ধান জানে না। কিন্তু আমি জানি। কারণ ?.. আমি যে রাত্রির সন্তান!"

ময়ূখ চৌধুরী
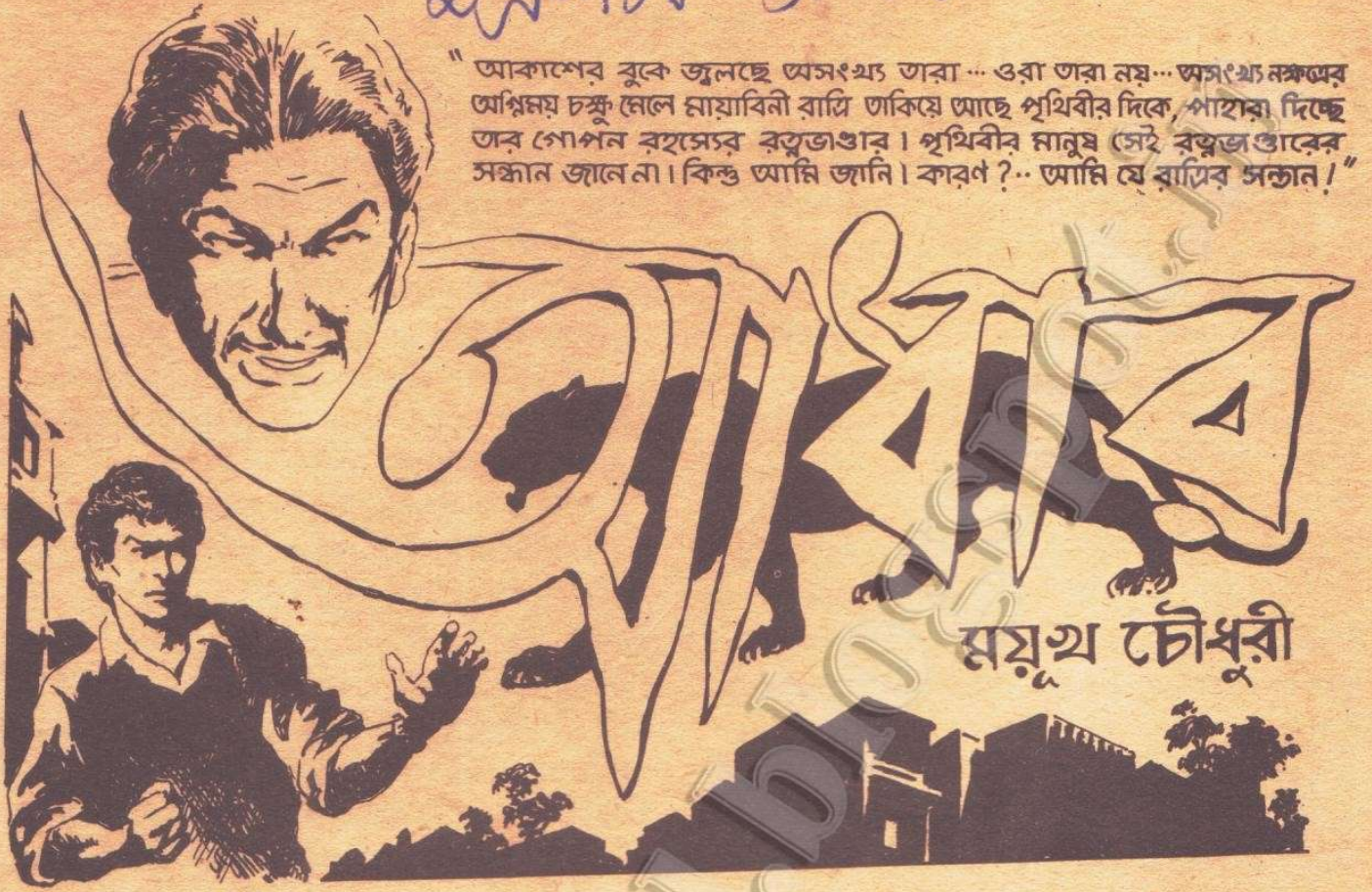
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অথ সারমেয় ঘটিত

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কাজল আবার তার কাহিনী শুরু করল, "সমস্ত পরিকল্পনা বুঝিয়ে দিয়ে সেই রাতে আমায় বিদায় দিল জোসেফ। একটা ট্যাক্সি নিয়ে গভীর রাত্রে সার্কাসের তাঁবুতে ফিরে এলাম। পরের দিন যৎসামান্য জিনিস নিয়ে জোসেফ এল আমার আস্তানায়। দুদিন পরে আমার খেলা শুরু হওয়ার কথা। শয়তানই আমার খেলার প্রধান আকর্ষণ। অথচ তখন পর্যন্ত জন্তুটাকে আমি ভালো করে বাগ মানাতে পারি নি। বেগতিক দেখলে ব্ল্যাক জাগুয়ারের খেলা বন্ধ করে দিতে পারি, তবে সে-ক্ষেত্রে আমার মান-মর্যাদা থাকবে না। কাজেই বেশ দুশ্চিন্তা ছিল। জোসেফের পরিকল্পনা যদি কার্যকরী হয়, তাহলে অবশ্য চিন্তার কারণ নেই, কিন্তু"—

বাধা দিয়ে সীমা বলে উঠল, "জোসেফের পরিকল্পনার বিষয় কিন্তু তুমি এখন পর্যন্ত কিছুই বলো নি।"

"যথাসময়ে জানতে পারবি," কাজল বলতে লাগল, "এখন বাধা দিস না। সেদিন নৈশভোজন শেষ হওয়ার পর জোসেফকে আমার তাঁবুতে রেখে আমি রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। মনের ভিতর তখন ঝড় চলছে। পথে পথে ঘুরে বেড়ালাম। রাত এগারোটার পর ফিরে এলাম। তাঁবুর মধ্যে জোসেফকে দেখলাম। একটা বইএর পাতায় ডুবে রয়েছে সে। বইটি সাধারণ বই নয়, হাতে-লেখা পুঁথি। অত্যন্ত জরাজীর্ণ, ভাষাও আমার কাছে দুর্বোধ্য। সার্কাসের অন্যান্য লোকজন অধিকাংশই শুয়ে পড়েছে। যারা এখনও শয্যা আশ্রয় করে নি, তারা শয়নের উদ্‌যোগ করছে। আমি এদিক-ওদিক ঘুরে তাঁবুর চারদিক পর্যবেক্ষণ করলাম, তারপর ফিরে এসে হাতে-লেখা পুঁথি সম্পর্কে জোসেফকে কয়েকটা প্রশ্ন করলাম। নিরুত্তরে একবার আমার দিকে তাকিয়ে আবার পুঁথির পাতায় মনোনিবেশ করল জোসেফ। একসময়ে বারোটা বাজল। আমি এগিয়ে গিয়ে জোসেফের কাঁধে হাত রাখলাম। জোসেফ জানাল এখনও সময় হয় নি। আমার তখন অসহিষ্ণু অবস্থা। জোসেফের পরিকল্পনা কার্যকরী হয় কি না জানার জন্য ছটফট করছি। কোনরকমে সময় কাটানোর জন্য বরিস এডার নামে সোভিয়েট রাশিয়ার বিখ্যাত সার্কাস-খেলোয়াড়ের একটি বই নিয়ে বসলাম। কিছুক্ষণ পরে আবিষ্কার করলাম আমার চোখদুটো অর্থহীন ভাবে বইএর পাতায় ঘুরেছে, লিখিত বক্তব্যের কিছুই বোধগম্য হয় নি!

সব কিছুরই শেষ আছে। একসময় আমার প্রতীক্ষারও শেষ হল। পুঁথি বন্ধ করে উঠল জোসেফ। এবার সময় হয়েছে। ঘড়িতে দেখলাম কাঁটায় কাঁটায় একটা। জোসেফ আমায় ইঙ্গিত করতেই আমি তার দিকে একটা থলি এগিয়ে

দিলাম। থলিটা খুলল জোসেফ, মস্ত বড় একটুকরো মাংস বেরিয়ে এল। পকেট থেকে একটা শিশি বার করল জোসেফ, তারপর ছুরি দিয়ে মাংসের টুকরোটাকে জায়গায় জায়গায় চিরে ফেলল। শিশির ভিতর থেকে এক ধরণের সাদা গুঁড়ো বার করে সে ছড়িয়ে দিল ছিন্ন ভিন্ন মাংসের টুকরোর উপর। আমি বুঝলাম মাংসের সঙ্গে মিশে গেল প্রাণঘাতী তীব্র বিষ। সেই বিষাক্ত মাংস নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে দেখলাম আমার বিছানার উপর টান হয়ে শুয়ে পড়ল জোসেফ।

ব্ল্যাক জাগুয়ার শয়তান তখন অস্থিরচরণে পায়চারি করছিল খাঁচার মধ্যে। খাঁচাটার পাশে এসে দাঁড়ালাম। হিংস্র দন্তবিকাশ করে আমায় অভ্যর্থনা জানাল শয়তান।

মাংসের টুকরোটা খাঁচার ফাঁক দিয়ে ছুঁড়ে দিলাম। ক্ষুধার্ত শ্বাপদ সেটাকে লুফে নিল। জোসেফের পরামর্শে জন্তুটাকে আমি সারাদিন অভুক্ত রেখেছিলাম।

জোসেফের কাছে শুনেছিলাম বিষটা অতি ভয়ংকর। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই তীব্র বিষের ক্রিয়া দেখতে পেলাম। শূন্যে থাবা বিস্তার করে হঠাৎ ছটফট করে উঠল জন্তুটা, তারপর নিঃশব্দে শুয়ে পড়ল। খাঁচার ফাঁক দিয়ে আবছা আলো-আঁধারির মধ্যে তার নিস্পন্দ দেহটা কিছুক্ষণ লক্ষ্য করলাম, তারপর খাঁচার দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে গেলাম। গায়ে হাত দিয়ে পরীক্ষা করে বুঝতে পারলাম জন্তুটার মৃত্যু হয়েছে। তাড়াতাড়ি তাঁবুতে জোসেফের কাছে গিয়ে শয়তানের মৃত্যুসংবাদ দিলাম। জোসেফ আমাকে আবার ফিরে যেতে বলল শয়তানের কাছে। তাকিয়ে দেখলাম জোসেফের দুই চোখ বুজে গেছে। ফিরে এলাম শয়তানের খাঁচার মধ্যে, স্থির দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগলাম তাকে।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ তার দেহটা নড়ে উঠল। তারপরই জন্তুটা উঠে বসে আমার দিকে তাকাল। বুকের মধ্যে মুহূর্তের জন্য ভয়ের ধাক্কা লাগল। কিন্তু ভয় পেলে চলবে না, নিজেকে সামলে নিয়ে পরবর্তী ঘটনার জন্য প্রস্তুত হলাম। ধীরে ধীরে এগিয়ে এল শয়তান, পিছনের পায়ে ভর করে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আমার কাঁধের উপর দুই থাবা তুলে দিল। তারপর ডান থাবা তুলে আমার বাঁ কাঁধে দুবার চাপড় মারল। আমরা যেমন করে কারও কাঁধ চাপড়ে আনন্দ জানাই, অবিকল সেই ভঙ্গী!

আমি তাকে বসতে বললাম। বসল। দাঁড়াতে বললাম। দাঁড়াল। বাইরে বেরিয়ে এসে খাঁচার দরজায় চাবি দিলাম। শয়তান বাধা দিল না। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। চোয়ালটা একটু ঝুলে পড়ে আবছা আলোয় কয়েকটা দাঁত ঝকঝক করে উঠল। মনে হল জন্তুটা হাসছে!

এবার ফিরে গেলাম জোসেফের কাছে। তার নাকে হাত দিয়ে বুঝলাম নিঃশ্বাস পড়ছে না। বুকে মাথা রাখলাম, হৃদপিণ্ডে স্পন্দন নেই। পরিকল্পনা অনুসারে ঘড়ি দেখলাম। রাত দেড়টা। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম শয্যাশায়ী জোসেফের প্রাণহীন দেহটার দিকে। হঠাৎ নড়ে উঠল মৃতদেহ! তারপর বন্ধ চোখ দুটো খুলে গেল, শুনতে পেলাম জোসেফের কণ্ঠস্বর, 'মিঃ চৌধুরি! এবার বিশ্বাস হচ্ছে?' কথা বলার ক্ষমতা ছিল না। ঘাড় নেড়ে জানালাম বিশ্বাস হয়েছে।"

কাজলের কথা শেষ হল। অস্বাভাবিক স্তব্ধতা ঘনিয়ে এল ঘরের মধ্যে। প্রথম নীরবতা ভঙ্গ করলেন শ্রীময়ী, "কাজল, ব্যাপারটা তাহলে কী হল? জোসেফের আত্মা কি জন্তুটার দেহে প্রবেশ করেছিল? তাই যদি হয়, তাহলে জোসেফ জীবন্ত হয়ে উঠলে শয়তানের বেঁচে থাকার কথা নয়।"

"বেঁচে থাকে না", শুষ্কস্বরে কাজল বলল, "দিনের বেলা শুধু খাদ্য গ্রহণের সময় ছাড়া অন্য সময়ে সার্কাসের লোকরা শয়তানকে ঘুমোতেই দেখে। আসলে ওটা ঘুম নয়, মৃত্যুর নামান্তর মাত্র। জোসেফ যখন দিনের বেলা চলাফেরা করে, শয়তানের মৃতদেহ তখন পড়ে থাকে খাঁচার মধ্যে। একটা কালোকাপড় দিয়ে খাঁচাটা ঢাকা থাকে। শয়তানকে দিনের মধ্যে একবার খাওয়ানো হয়। সেই মাংস আমিই দিয়ে আসি। সেই সময় আমার বিছানায় শুয়ে থাকে জোসেফ। কেউ যদি তখন জোসেফকে পরীক্ষা করে, তাহলে তার দেহে জীবনের কোন লক্ষণই খুঁজে পাবে না। অবশ্য আমার অনুমতি ছাড়া আমার নিজস্ব তাঁবুতে কেউ প্রবেশ করতে পারে না। তাও যদি দৈবক্রমে কেউ আমার তাঁবুতে আসে, তাহলে শয্যার উপর জোসেফকে দেখলে তাকে নিদ্রিত মনে করে স্থানত্যাগ করবে। জোসেফ যে আমার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু, এই কয়দিনে সার্কাসের সব লোকই তা জানতে পেরেছে। আমার বিছানায় তাকে শুয়ে থাকতে দেখলে কেউ কিছু মনে করবে না। কাজেই দুপুরবেলা শয়তানের খাওয়ার সময় জোসেফের জীবন্ত মৃতদেহ আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। রাতেও একই অবস্থা। শয়তানের খেলা শেষ হয়ে গেলে সে খাঁচায় ঢুকে মরণ ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ে আর শয্যাশায়ী জোসেফের নিস্পন্দ দেহ হঠাৎ প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠে পড়ে এবং আমার তাঁবু ছেড়ে রওনা দেয় তার হোটেলের দিকে।

এক মাসের মধ্যেই আমি দারুণ জনপ্রিয় হয়ে উঠলাম। দর্শকরা কালো বাঘের খেলা দেখে মুগ্ধ। হিংস্র শ্বাপদ থাবা দিয়ে আঁচড় কেটে সার্কাসের মাটিতে অঙ্কের সংখ্যা লিখতে পারে, যোগ-বিয়োগ করতে পারে এবং তার প্রভু, অর্থাৎ আমার আদেশ পালন করে নির্বিবাদে। তারা আশ্চর্য হয়ে যায় যখন

দেখে আমার হাতে চাবুক পর্যন্ত নেই, শুধু মুখের কথাতেই আদেশ পালন করছে ভয়ংকর শ্বাপদ। কালো বাঘকে ঘড়ি দেখতে বললে সে ঘড়ি দেখে মাটিতে আঁচড় কেটে সময় জানিয়ে দেয়। ধরো, ঘড়িতে দেখা গেল নয়টা পনের—জন্তুটা নখের সাহায্যে সার্কাসের বালিভরা জমির উপর ইংরেজিতে নয় লিখে একটা লম্বা টান দিল, তারপর লিখল পনের। বলাই বাহুল্য, পরের সংখ্যাও সে ইংরেজিতেই লিখেছিল। এই রকম আরও অনেক খেলা আমরা আবিষ্কার করেছিলাম। জাগুয়ারের দেহে অবস্থান করে মানুষের আত্মা, অতএব আমার কথা বুঝে কাজ করতে তার অসুবিধা হয় না। কালো জাগুয়ারের অত্যাশ্চর্য খেলা দেখতে ভিড় জমে ওঠে সার্কাসের প্রদর্শনীতে। আমার 'কমিশন' বাড়তে থাকে। অবশ্যই তার একটা অংশ যায় জোসেফের পকেটে। অর্থের আগমন বন্ধ হলে জোসেফের রাগ হওয়ারই কথা। তোমাদের প্রতি, বিশেষ করে মায়ের প্রতি আমার আকর্ষণ বুঝতে পারত জোসেফ। তার ভয় ছিল একসময় হয়তো সব ছেড়ে দিয়ে আমি মায়ের কাছে চলে যেতে পারি। সেইজন্যই আমার সঙ্গে সংস্রব রাখতে তোমাদের নিষেধ করেছিল সে। তার কথা না শুনলে কী হবে স্পষ্ট করে বলে নি জোসেফ, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি সে তোমাদের হত্যা করার চেষ্টা করবে। তার অর্থের লালসা যতদিন তৃপ্ত না হবে, ততদিন সে আমাকেও মুক্তি দিতে চাইবে না।"

কাজলের অদ্ভুত বিবরণী শ্রীময়ী আর সীমাকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। একটু চুপ করে থেকে কাজল আবার বলল, "ছোটবেলায় মাকে হারিয়েছি, বাবাকেও খুব বেশীদিন পাই নি। মনে একটা অতৃপ্তি রয়েছে।"

একটু থেমে শ্রীময়ীর মুখের দিকে তাকাল কাজল, "কয়েকটা বছর আমি তোমার আশ্রয়ে থাকতে চাই, মা। জোসেফের ইচ্ছার দাস হয়ে স্বর্ণগর্দভে পরিণত হতে আমি চাই না। আমি সার্কাসের তাঁবুতে ফিরে গেলে তোমরা নিরাপদ হবে, কিন্তু এতদিন পরে তোমাদের কাছে পেয়ে সার্কাসের জীবনে আর ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না।"

"কেন ফিরে যাবি?" শ্রীময়ীর আর্দ্রকণ্ঠে বললেন, "আমাদেরই বা কে আছে বল্? আর বিপদই বা হবে কেন? আমাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা তুই করতে পারবি না?"

"পারব। তবে"—

কাজল হঠাৎ চুপ করল। দক্ষিণ করতলে চিবুক রেখে কী যেন ভাবতে শুরু করল।
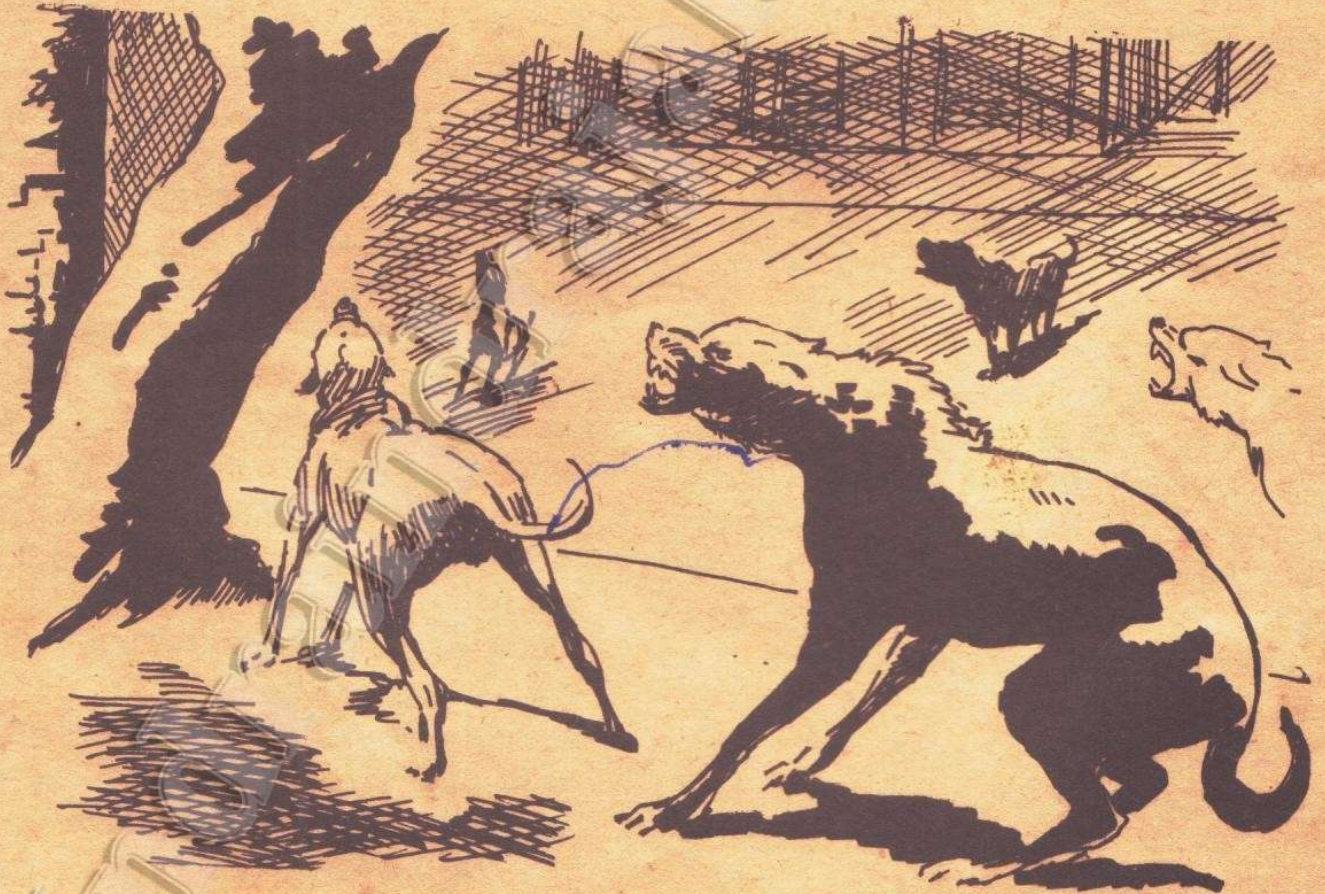
শ্রীময়ী বলে উঠলেন, "তবে বলে থামলি কেন ? কি বলতে চাস তুই ?"

কাজল বলল, "মা, তোমার কাছে বাবা ত্রিশ হাজার টাকা আমার জন্যে রেখে গেছেন এটা আমি জানতাম না। এতদিনে সুদে-আসলে টাকার অঙ্কটা নিশ্চয়ই আরো বেড়েছে। ঐ টাকায় আমার প্রয়োজন নেই। টাকাটা তুমি রেখে দিও। দরকার হলে টাকাটা তুমি সীমার বিয়েতে খরচ করতে পারবে। দরকার হলে বলছি কেন—দরকার তো হবেই—আমিও বোনের বিয়ের জন্য একটা মোটা অঙ্কের টাকা তোমার হাতে দিয়ে কাল সকালেই এখান থেকে চলে যাব।"

—"তার মানে ? একটু আগে বললি আমার কাছে থাকবি। এখন বলছিস চলে যাবি ? এই তোর ভালোবাসা ? মায়ের প্রতি, বোনের প্রতি কর্তব্য নেই তোর ? টাকা দিলেই সব কর্তব্য করা হল।"

"আমার বিয়ের জন্য তোমায় ভাবতে হবে না, "সীমা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, "তুমি তো প্রথম দিন থেকেই আমাদের দূরে ঠেলে দিতে চাইছ। মা যা-ই বলুক, আমি তোমায় থাকতে বলব না। আমাদের ভাগ্যে যা হওয়ার হবে, তুমি স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারো।"

কাজলের মুখে করুণ হাসি ফুটল, "আমি সার্কাসে ফিরে গেলে তোদের বিপদের ভয় নেই। তোদের স্নেহ-ভালোবাসা, মা-বোনের আদর পাওয়ার লোভই আমায় টেনে এনেছে তোদের কাছে। কিন্তু ভেবে দেখছি তোদের বিপন্ন করা উচিত হবে না। আমি তো তোদের কাছে থাকতেই চাই, শুধু জোসেফের ভয়ে"—

বাধা দিয়ে সীমা বলল, "জোসেফ কী করতে পারে দাদা ? এটা বিংশ শতাব্দী। দেশে সরকার আছে, পুলিস আছে। তুমিও একটা নিরীহ নির্জীব গোছের মানুষ নও। একটা জাদুকরের ভয়ে তুমি মা-বোনকে ফেলে চলে যাবে ?"

—ঐখানেই তো আমার পৌরুষে লাগছে সীমা। তবে জোসেফকে তুই তুচ্ছ ভাবিস না। ইউরোপে একসময় 'ব্ল্যাক ম্যাজিক' বলে একধরনের জাদুবিদ্যা প্রচলিত ছিল। ঐ বিদ্যা যে-সব জাদুকর আয়ত্ত করতে পেরেছিল, তারা অসাধ্যসাধন করতে পারত। আমার মনে হয় ঐ গুপ্তবিদ্যা এখনও পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে যায় নি। যে ভাবেই হোক 'ব্ল্যাক ম্যাজিক' নামে কুখ্যাত জাদু নিয়ে অনুশীলন করেছে জোসেফ। সাধনায় কিছুটা সিদ্ধিলাভ যে তার হয়েছে, তাতো আমি স্বচক্ষেই দেখেছি। সেইজন্যেই তো ভয় পাচ্ছি।"

—"বাজে কথা ছাড়ো। তোমার কোথাও যাওয়া হবে না দাদা। একটু আগেই তুমি বলছিলে আমাদের নিয়ে ভারত-ভ্রমণে বেরিয়ে পড়বে, এখন আবার অন্য সুরে গাইছ কেন ? না, না, তুমি আমাদের ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না।

—"বলছিস ?"

"হ্যাঁ। বলছি।"

—"কিন্তু সীমা, তুই তো খুব বেশীদিন আমাদের সঙ্গে থাকতে পারবি না।"

—"কেন ? কেন ?"

—"যখন এসে পড়েছি, তখন দাদার কর্তব্য তো করতেই হবে। একটা ভালো ছেলে দেখে তোর বিয়ে দিতে হবে না ?"

হঠাৎ বিয়ের প্রসঙ্গ অপ্রত্যাশিত। সীমা কয়েক মুহূর্ত হাঁ করে দাদার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপরই মুখ লাল আর চোখ নিচের দিকে, "ধ্যেৎ ! বাজে কথা বোলো না তো।"

হেসে উঠে কী-যেন বলতে যাচ্ছিল কাজল, বলা হল না। আচম্বিতে মধ্যরাতের স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে জাগল এক প্রচণ্ড জান্তব কোলাহল ! অনেকগুলো কুকুর তারস্বরে চিৎকার করে উঠেছে বাড়ীটার খুব কাছেই !

কাজলের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল, তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল সে।

সীমা বলল, "কুকুরের ডাক শুনে এমন ভড়কে গেলে কেন দাদা ?"

"শুনতে পাচ্ছিস না কুকুরগুলো কেমন উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করছে ?"

—"তাতে ভয় পাওয়ার কি আছে ? কুকুর তো কত কারণেই চ্যাঁচায়। হয়তো পাড়ায় চোর ঢুকেছে।"

—"নারে সীমা, ব্যাপারটা অত সহজ নয়। জানোয়ার নিয়ে বহুদিন কাটিয়েছি। সার্কাসে কুকুরের খেলাও দেখিয়েছি। কুকুরের স্বভাব-চরিত্র আমি ভালোভাবেই জানি। কুকুরগুলো কিছু দেখে ক্ষেপে গেছে, কিন্তু ভয়ও পেয়েছে সেইজন্যই ঐভাবে ডাকছে।"

হঠাৎ একটা তীব্র আর্তরব উঠল, স্পষ্টই বোঝা গেল আর্তনাদ করতে করতে কুকুরগুলো বাড়ীর সামনে থেকে সরে যাচ্ছে...

মাথার উপর ছাতে একটা শব্দ হল—ধপ্ !

গুরুভার কোন বস্তু যেন ছাতের উপর ছিটকে এসে পড়েছে !

[ক্রমশঃ

বিশ্ব-বিচিত্রা

ছাতার মত দেখতে প্যারাশুট হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে ওপর থেকে ধীরে ধীরে মাটিতে নেমে আসে।

কিছু উদ্ভিদ তাদের বীজ ছড়াতে প্যারাশুটের মতই ব্যবস্থা নেয়। এ ব্যাপারে বিশেষভাবে নাম করা যেতে পারে 'ড্যানডিলাইঅ্যান্'এর।
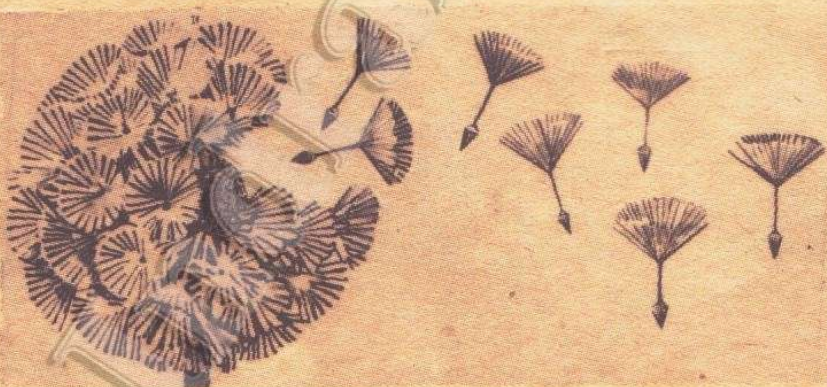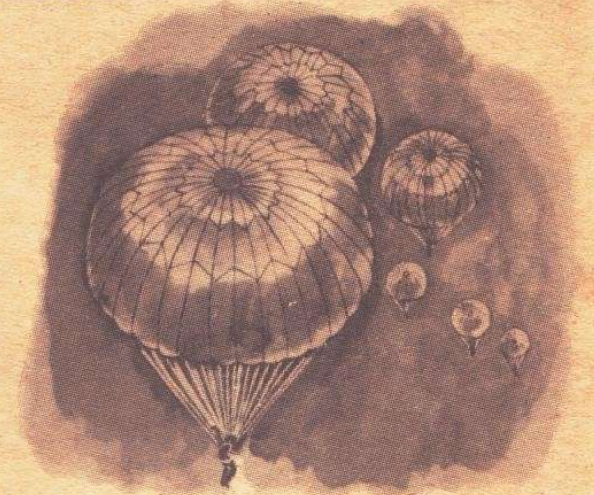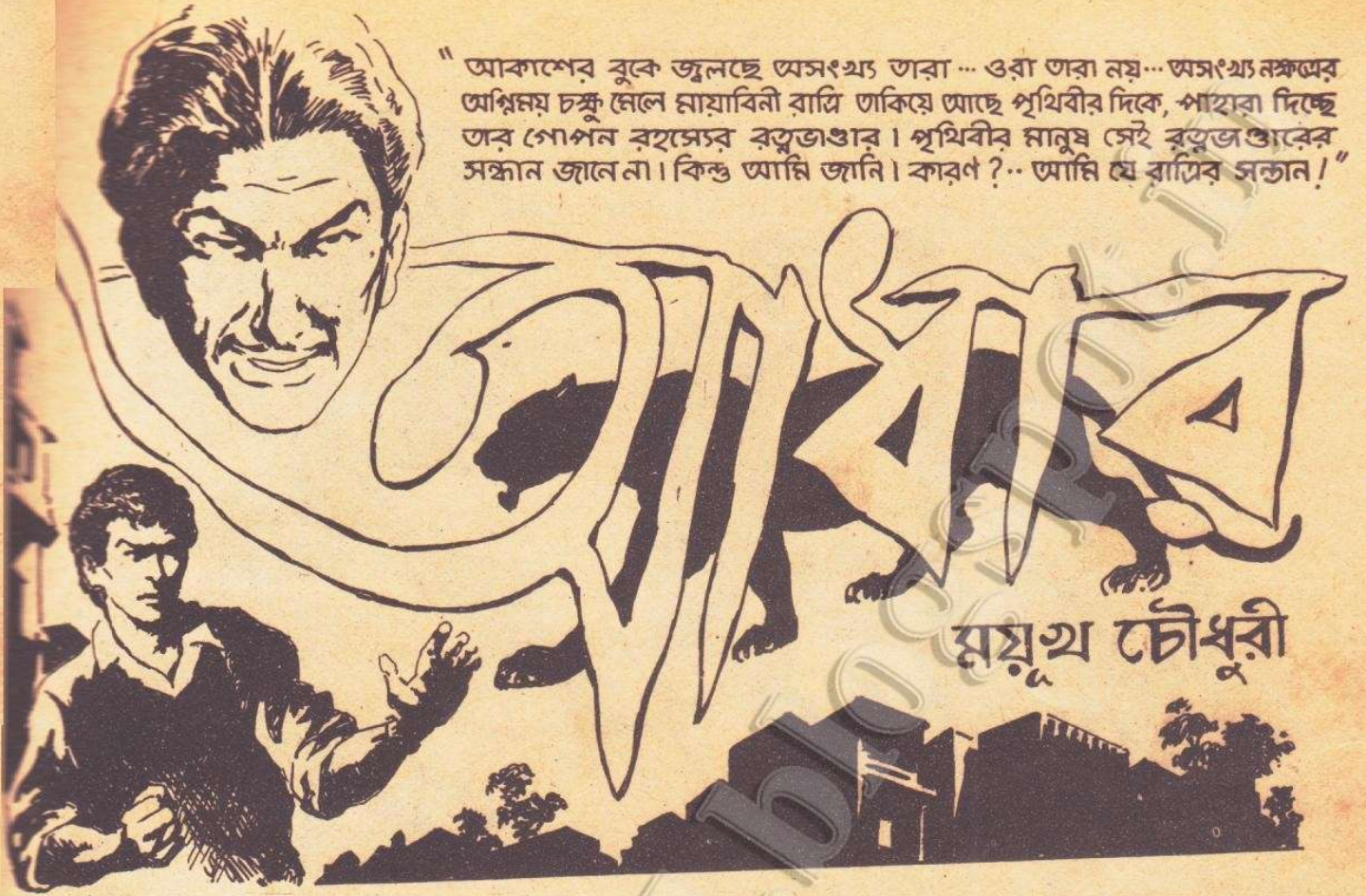
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিভীষিকার আবির্ভাব

শব্দটা সবাই শুনেছিল। স্তব্ধতা ভঙ্গ করল সীমা, "মনে হল বাড়ীর পাশের গাছটা থেকে কিছু যেন লাফিয়ে পড়ল ছাতের উপর—তাই না মা ?"

শ্রীময়ী মাথা নাড়লেন, "হ্যাঁ, গাছের ডালপালার মধ্যে একটা শব্দ আমি শুনেছি।"

হঠাৎ যেন কিছু মনে পড়ায় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন শ্রীময়ী, "হ্যাঁ রে সীমা, ছাতের দরজা বন্ধ করেছিলি তো ?"

সীমার মুখ শাদা হয়ে গেল, "না, মা। ভুল হয়ে গেছে। —"সর্বনাশ !"

"কিছু সর্বনাশ হয় নি, দরজাটা আমি বন্ধ করে দিয়ে আসছি," কাজল বলল", ছাতে ওঠার সিঁড়িটা দেখিয়ে দে সীমা।"

সীমা উঠে দাঁড়িয়ে অগ্রসর হল, কিন্তু দরজার সামনে দাঁড়িয়েই ভয়ার্ত চিৎকার করে ঘরের ভিতর পিছিয়ে এল। পরক্ষণেই মুক্ত দ্বারপথে দেখা দিল অতিকায় কালো বিড়ালের মতো একটা জানোয়ার—ব্ল্যাক জাগুয়ার শয়তান !

মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেই ভয়ানক জন্তুর দিকে তাকিয়ে রইল সীমা। শ্রীময়ীও চেয়ে ছিলেন জন্তুটার দিকে। শয়তান ঘাড় ঘুরিয়ে ঘরের ভিতরটা পর্যবেক্ষণ করল, তারপর তার জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ হল শ্রীময়ীর দিকে।

মা আর বোনকে আড়াল করে দাঁড়াল কাজল, তার ডানহাতের মুঠির মধ্যে চকচক করে উঠল একটা ছোট আগ্নেয়াস্ত্র। পিস্তলটা জাগুয়ারের দিকে উঁচিয়ে ধরে কাজল বলল, "জোসেফ ! এখানে হামলা করে লাভ নেই। এখনই পিস্তলের গুলিতে তোমার মাথা ঝাঁঝরা করে দিতে পারি। জানি, তোমাকে হত্যা করা সম্ভব নয়। তোমার প্রাণপাখি এই জান্তব আধার ছেড়ে আবার মনুষ্যদেহে আশ্রয় নেবে। কিন্তু আঘাতের যন্ত্রণা তুমি এড়িয়ে যেতে পারবে না। গুলিতে এই জন্তুটার মাথা ফুটো হয়ে গেলে এই শরীরটার মধ্যেও তুমি থাকতে পারবে না।"

জাগুয়ার নিঃশব্দে মুখ-ব্যাদান করল। রক্তিম মুখ গহ্বরের ভিতর থেকে উঁকি দিল ঝকঝকে দাঁতের সারি।

কাজল অবিচলিত কণ্ঠে বলল, "জোসেফ, তুমি অনেক টাকা পেয়েছ। আমার কাছে আর আশা কোরো না। এখান থেকে চলে যাও। নইলে গুলি ছুঁড়তে বাধ্য হব।

কাজল আবচলিত কণ্ঠে বলল, "জোসেফ, তুমি অনেক টাকা পেয়েছ। আমার কাছে আর আশা কোরো না। এখান থেকে চলে যাও। নইলে গুলি ছুঁড়তে বাধ্য হব।"
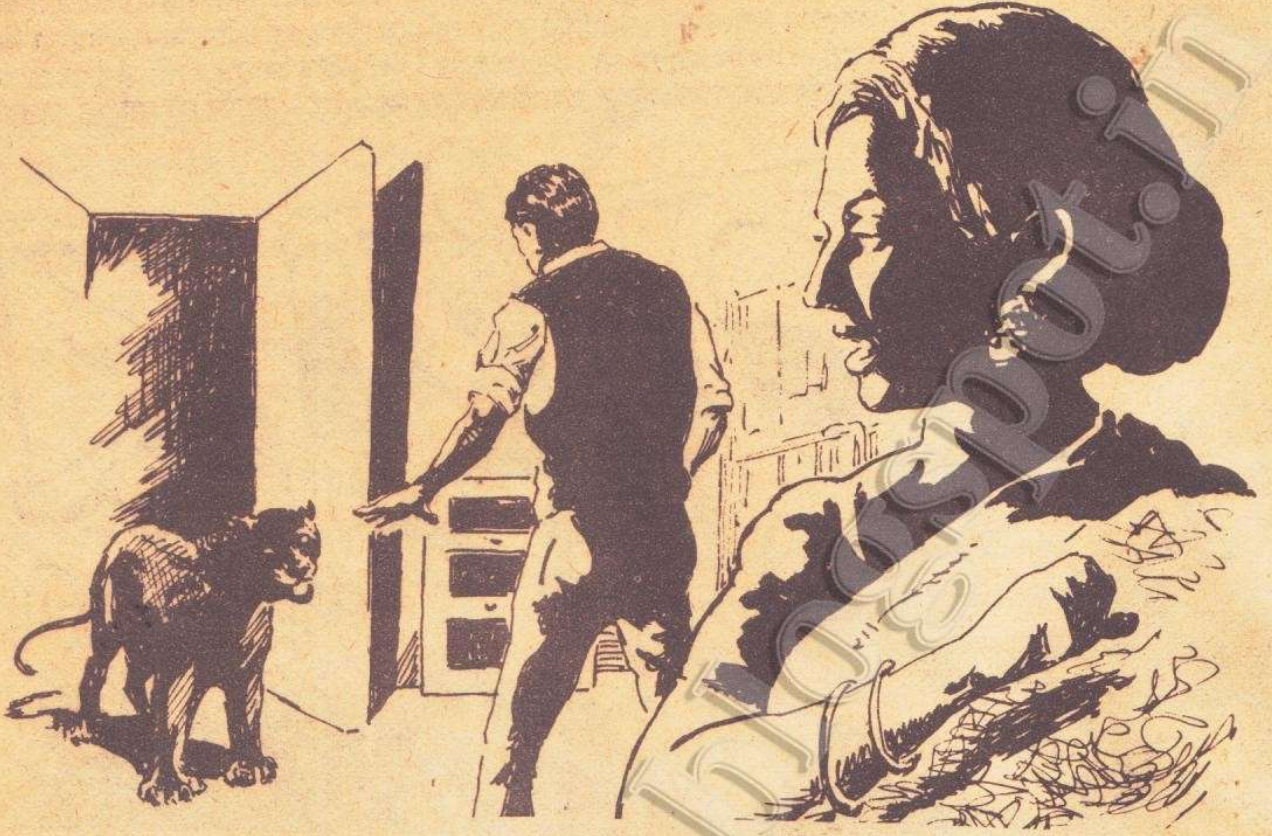
জাগুয়ার নিঃশব্দে দন্তবিকাশ করল। কাজল বলল, "আমায় ভয় দেখিয়ে লাভ নেই। শোনো জোসেফ, আমায় না মেরে আমার মা-বোনকে তুমি ছুঁতে পারবে না। ওদের হত্যা করলেও আমায় তুমি আর ফিরে পাবে না। অতএব চলে যাও জোসেফ, এখান থেকে চলে যাও।"

জাগুয়ার একবার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে কাজলের মুখের দিকে চাইল, তারপর নিঃশব্দে ধীর পদক্ষেপে দরজার বাইরে অন্তর্ধান করল।

কয়েক মুহূর্ত পরেই পাশের গাছটার উপর একটা গুরুভার বস্তুর ঝাঁপিয়ে পড়ার শব্দ ভেসে এল। সকলেই বুঝল জন্তুটা ছাত থেকে ঐ গাছটার উপরে লাফিয়ে পড়েছে—গাছের ডালপালার সঙ্গে শ্বাপদের দেহের সংঘাতেই পূর্বোক্ত শব্দের সৃষ্টি···

একটা মোটর গাড়ি চালু করার শব্দ ভেসে এল রাস্তার উপর থেকে।

"আপদ বিদায় হল", কাজল বলল, "কিছু না দেখেও বলতে পারি ঐ গাড়িটা চালাচ্ছে জোসেফ আর গাড়ির ভিতর মরণ ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছে শয়তান নামে ব্ল্যাক জাগুয়ার।··· চল্ সীমা, সিঁড়ির দরজা বন্ধ করে আসি। অবশ্য এখন আর বিপদের ভয় নেই। তবু সাবধান হওয়া উচিত। আজকের রাত্রি পার হয়ে গেলে শত্রু আর আমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। কাল দুপুরের মধ্যেই কলকাতা ছেড়ে আমরা সরে পড়ব।"

—"কোথায় দাদা ?"

—"এই মুহূর্তে বলতে পারছি না। তবে দুপুরের পর কেউ কলকাতায় থাকছি না। বাকি রাতটা মনে হচ্ছে কারোই ঘুম আসবে না, তবু চুপচাপ শুয়ে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করতে হবে—আর কিছু তো করার নেই।"

পরিশিষ্ট

দুদিন পরের কথা। দার্জিলিং-এর একটা হোটেলে সকালবেলা ধূমায়মান চায়ের কাপ নিয়ে বসেছিল কাজল। পাশেই ছিলেন শ্রীময়ী। তাঁর হাতেও গরম চায়ের কাপ।

হঠাৎ ঝড়ের মতো ঘরে প্রবেশ করল সীমা, একটা খবরের কাগজ কাজলের সামনে মেলে ধরে বিশেষ একটি জায়গায় আঙুল নির্দেশ করল, "দেখেছ দাদা ?"

শ্রীময়ী বলে উঠলেন "কিসের খবর ?"

কাগজটা টেনে নিয়ে জোরে জোরে পড়তে শুরু করল কাজল—

"ইম্পিরিয়াল সার্কাস কোম্পানিতে একটি দুর্ঘটনার সংবাদ

পাওয়া গেছে-। সম্প্রতি একটা কালো জাগুয়ারের খেলা ঐ সার্কাসে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। অঞ্জন ঘোষ নামে একজন দুঃসাহসী খেলোয়াড় ঐ কালো জাগুয়ারের খেলা দেখিয়ে অল্পদিনের মধ্যেই যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। গতকাল খাঁচার ভিতর ঐ জন্তুটিকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। জন্তুটির দেহে কোন আঘাতের চিহ্ন ছিল না। আরও আশ্চর্যের বিষয় যে, জন্তুটার মৃত্যুর আগের দিন পূর্বোক্ত খেলোয়াড় অঞ্জন ঘোষ সার্কাসের মালিকের সঙ্গে দেখা করে সার্কাসের কাজে ইস্তফা দিয়ে গেছেন। তাঁর বিদায় নেওয়ার আগে কেউ জন্তুটার দিকে নজর দেয় নি। তিনি চলে যাওয়ার পরে জন্তুটার খাওয়ার সময় যথারীতি মাংসের টুকরো ফেলে দেওয়া হয় খাঁচার মধ্যে। জন্তুটা ঐ সময়ে শুয়ে বিশ্রাম করছিল। আরও বারো ঘন্টা কেটে যাওয়ার পর একসময়ে খাদ্য-পরিবেশক এসে দেখল জন্তুটা সেইভাবেই শুয়ে আছে, মাংসের টুকরো সে স্পর্শও করে নি। সন্দেহ হওয়ায় তখনই একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি খাঁচার দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করেন এবং পরীক্ষা করে বুঝতে পারেন জন্তুটার মৃত্যু হয়েছে।"

শ্রীময়ী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "যাক, বাঁচা গেল। ভবিষ্যতে আশা করি আর উপদ্রব ঘটবে না।"

কাজল হাসল, "জীবন্ত প্রেতের মতো জোসেফ এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে মহানগরীর বুকে। একটা আধার নষ্ট হয়েছে, আরও একটি আধার—অর্থাৎ আমি হাতছাড়া হয়েছি, কিন্তু জোসেফের মতো মানুষ কি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবে? প্রয়োজন বোধে নতুন আধার আবিষ্কার করে দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করার ইচ্ছা কি সে ত্যাগ করবে?… যাক্, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে আমরা বরং বর্তমানকেই উপভোগ করার চেষ্টা করি—কী বলো মা?"

শ্রীময়ী হাসলেন, "সেই ভালো।"

সীমার মুখেও হাসি ফুটল, "হ্যাঁ, দাদা। আর কোন ভয়ের কারণ আছে বলে মনে হয় না। তাছাড়া তোমার মতো ভাই কাছে থাকলে ভয় কী?"

শেষ